অবসর

হারুন হোসেন

ওরা কোথায়

ওয়েস্টার্ন

ওরা কোথায়

আঠারোশো ছিয়ানব্বই সাল। তৃষ্ণা, দুরুত্ব আর অ্যাপাচিদের আক্রমণকে উপেক্ষা করে সুদূর টেক্সাস থেকে আরিজোনায় পাড়ি জমালো দুই কালজয়ী পুরুষ। জন টুমি আর ক্লায়েড টুমি। সংগে পঁচিশজন কাউহ্যান্ড আর চার হাজার গবাদীপশু। বিরাট এলাকা কিনে আস্তানা গাড়লো ওরা ভার্ডের উপত্যকায়। তারপর হঠাৎ একদিন গায়েব হয়ে গেলো জলজ্যান্ত মানুষগুলো।

তার নব্বই বছর পর। পুরনো একটা পিস্তলের নলের ভিতর পাওয়া গেলো ডাইরীর কিছু ছেঁড়াপাতা। কৌতুহলী হয়ে উঠলো ড্যান শেরিডান। সুন্দরী বেলি আর অ্যাপাচি যোদ্ধা পিয়ো অ্যালভারেজ। ক্ষমা কি জিনিষ জানে না পিয়ো। দাউ দাউ করে জ্বলছে ভাই হত্যার প্রতিশোধের আগুন। শুরু হলো লড়াই। প্রতিপক্ষে আছে সেরা সেরা বন্দুকবাজ।

তবু জিততে হবে এ লড়াইয়ে। বের করতে হবে টুমি রহস্য। থ্রিল আর সাসপেন্সের সমন্বয়ে অপূর্ব এক ভিন্ন সাধের ওয়েস্টার্ন।

ওরা কোথায়

হারুন হোসেন

অবসর

প্রকাশক : ফজলুর রহমান। অবসর প্রকাশনা সংস্থা
৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৩/এপ্রিল ১৯৮৬
কাহিনী : একটি বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে : নাসিম প্রিন্টিং
৭ জয়েন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১
বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশক : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও যশোহর। স্টুডেন্ট ওয়েজ, মাওলা ব্রাদার্স, ডানা পাবলিশার্স, বড়াল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ম্যারিয়েটা (ঢাকা স্টেডিয়াম)।

এক

জমাটবাঁধা রক্তের মধ্যে পড়ে আছে লোকটা। মোটেলের মেইন গেটের পাশেই। আগে কখনও দেখি নি তাকে। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে অ্যাপাচি যোদ্ধা। ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে লোকটাকে।

দুটো পুলিশ ভ্যান আলো ফেলে রেখেছে লাশটার ওপর। পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো জনাকয়েক পুলিশ। অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা করছে তারা।

'মিঃ শেরিডান, এই রাত দুপুরে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য সত্যি দুঃখিত। ভেবেছিলাম লোকটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন।' একটু আগেই ডিটেকটিভ সার্জেন্ট টম রেলি তার পরিচয় দিয়েছেন আমাকে। কথা বলছেন খুব বিনয়ের সাথে। কিন্তু এত রাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য তিনি যে মোটেও বিব্রত বোধ করছেন না, তা জানি আমি।

একটা খবরের কাগজ বাড়িয়ে ধরলেন টম রেলি। লক্ষ্য করলাম কাগজটা আগের দিনের। এই শহরে আমার আগমন এবং পশ্চিমা

ইতিহাসের ওপর গবেষণা সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হয়েছে তাতে। তবে একটা কথার উল্লেখ নেই খবরে। টেলিভিশন সাক্ষাতকারের এক অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছিলাম, 'অন্য সবকিছুর সাথে টুমিদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো তা-ও উদঘাটন করার ইচ্ছা আছে আমার।'

সাক্ষাতকার নেয়ার সময় ভদ্রলোক অন্যমনস্কতার জন্যই হোক, বা না জেনেই হোক, খেয়াল করেন নি কথাটা। তাই বক্তব্যটা ডিঙিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান তিনি।

টুমিদের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কাহিনীটা অনেক দিন ধরে গোপন করে রেখেছি মনের মধ্যে। সুবিধা মতো সময়ে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেলবো।

টুমিরা টেক্সাস থেকে আরিজোনায় এসেছিলো প্রায় নব্বই বছর আগে। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তাদের অভিযানের প্রামাণ্য দলিল তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তার পরেরটুকু সবই অন্ধকার। চার হাজার গরু আর একশজন জলজ্যান্ত মানুষ কোথায় যে হারিয়ে গেলো, কেউ জানে না।

'আপনার তেমন কোনো উপকারে আসতে পারছি না, সার্জেন্ট। আগে কখনও দেখি নি একে।'

'কিন্তু লোকটা আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলো কেন, আন্দাজ করতে পারেন কিছু?'

'সব রকম লোকের সাথেই কথা বলতে হয় আমাকে। তবে বেশির ভাগ আসে আমার ভক্তরা। আমার লেখার সমালোচক। অনেক সময় নতুন লেখকরা আসেন তাদের লেখার ব্যাপারে সাহায্য নিতে। হয়তো দেখা গেলো কথা বলতে বলতে সুন্দর একটা গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম।'

'অ্যালভারেজ নামটা শুনেছেন কখনও ?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন টম রেলি।

'দুঃখিত, সার্জেন্ট। লোকটাকে সত্যিই চিনি না।'

এখানেই প্রসঙ্গটা শেষ হওয়া উচিত ছিলো। আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠেছি বিছানায় যাবার জন্য। সারাদিনের ছোটাছুটিতে ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছি।

কিন্তু ততো সহজ হলো না ব্যাপারটা। মোটেল অফিসের জানালার পাশ দিয়ে রুমে যাবার সময় হাত তুলে ডাকলো কেরানীটা। 'মিস্টার শেরিডান, কয়েকটা চিঠি আছে আপনার। সন্ধ্যায় রুমে যাবার সময় দেখি নি আপনাকে।'

একটা টেলিগ্রাম আর কয়েকটা চিঠি দিলো কেরানীটা। মুখ খুললাম একটা একটা করে। টেলিগ্রামটা আমার প্রকাশকের। একটা সাক্ষাতকারের ব্যাপারে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেটা অবশ্য দশদিন পরের ব্যাপার। সংবাদপত্রের এক মহিলার একটা টেলিফোন মেসেজ। একটা বিচার লিখতে চান তিনি। পশ্চিমা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ওপর লেখা বইটার কয়েকটা সমালোচনা। শেষেরটা হিজিবিজি হাতের লেখা ছোট্ট একটা চিঠি। তাতে লেখা, 'কিছু তথ্য আছে আমার কাছে। রাত একটায় আসবো।—ম্যানুয়েল অ্যালভারেজ।'

করিডোর ধরে দ্রুত ছুটে এলাম বাইরে। এক পা জীপে তুলে দিয়েছেন সার্জেন্ট রেলি।

'মিস্টার রেলি! এক মিনিট।'

ডাক শুনে থমকে গেলেন সার্জেন্ট রেলি। চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'রাত একটায় কেন ?'

'আমার বক্তব্য আপনি আগেই শুনেছেন, মিস্টার রেলি। আসলে যে পেশায় নিয়োজিত আছি তাতে কে কখন দেখা করতে আসবে, বলা মুশকিল।'

'চিঠিটা নিতে পারি আমি?'

'বেশতো। নিন। তবে ঘটনাটা আমাকেও বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে। লোকটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে অবশ্যই জানাবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জীপে চড়ে বসলেন সার্জেন্ট রেলি।

ঘুম হলো না বাকি রাতটা। সকাল নটায় বেরোলাম মোটেল থেকে। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে খবরের কাগজ কিনলাম একটা।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখলাম খবরটা। শিরোনামটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো।

চৌদ্দ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ভাইয়ের মৃত্যু

গত রাতে মোটেল নিড সামারের সামনে ম্যানুয়েল অ্যাল-ভারেজ নামক এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে তাকে। তার অপর ভাই পিট অ্যালভারেজ মারা যায় গরু চুরির সময় পুলিশের গুলিতে।

খবরের শেষ প্যারাটা তৃতীয় ভাই পিয়ো অ্যালভারেজ সম্পর্কে। মাত্র কদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে সে।

পিয়ো? পিয়ো অ্যালভারেজ? সার্জেন্ট পিয়ো অ্যালভারেজ?

তাহলে না জেনে টম রেলিকে ভুল তথ্য দিয়েছি আমি। যদিও একথা সত্য ম্যানুয়েল অ্যালভারেজকে চিনি না, কিন্তু পিয়ো সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি।

যুদ্ধে একই কোম্পানীতে ছিলাম আমরা। কোর্টমার্শালে পিয়োর বিচার হয়েছিলো তিনবার আর কোম্পানীতে বেশ কবার। তবে সে যে একজন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা তাও প্রমাণ করেছিলো সে। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুজনেই আহত হয়ে বন্দী হয়েছিলাম শত্রুর হাতে। আবার মুক্তও হয়েছি একসাথে। মন্দ লাগে নি লোকটাকে।

পিয়ো প্রায়ই গর্বের সাথে বলতো, ওর শরীরের বারো আনা রক্ত অ্যাপাচি গোত্রের আর চার আনা সনোরার ইয়াংকীদের।

রক্ত আর গোত্রের পরিচয় সূত্রে পিয়ো শুধু এক ধরনের যুদ্ধই করতে পারতো। সেটা হলো জেতার যুদ্ধ। গরুর গাড়িতে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে পালাবার সময়ও যুদ্ধ করেছে ও। পিয়ো সঙ্গে না থাকলে আমারও পালানো হতো না।

পত্রিকার খবরটা পড়ার সাথেই ছবির মতো মনে পড়ছে সবকিছু। কিন্তু কি হবে এসব মনে রেখে?

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি আমরা। এক কম্বলের নিচে ঘুমিয়েছি। সে সব সুদূর অতীতের কথা। এখন আমরা আলাদা জগতের মানুষ। পিয়ো সব সময়ই ছিলো অশান্তি আর গোলমাল পাকাবার হোতা। এতদিনে ও বদলেছে, এমনটা ভাববার কোনো কারণই নেই আমার। আমি এই শহরে আছি এবং পিয়োর বিশেষ বন্ধু ছিলাম এক সময়, তা জেনেই হয়তো ম্যানুয়েল দেখা করতে চেয়েছিলো আমার সাথে।

হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির লাইব্রেরিতে সকালের কাজ করে কিছুই হলো না। পুরোনো খবরের কাগজের ফাইলে কোনো হদিসই পেলাম না ক্লায়েড বা জন টুমির।

টুমিরা আরিজোনায় আসে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে। প্রেস-

কট উপত্যকার কাছে ওদের বেশ কিছু পশু ছিনিয়ে নেয় ইণ্ডিয়ানরা। এর এক কি দুই বছর পর মাত্র কয়েকশো পশু নিয়ে স্টিভেন আসে ইডাপাই কাউন্টিতে। দিন রাত পাহারা দিয়ে স্টিভেন তার পশুগুলো রক্ষা করেছিলো। ঐ অঞ্চলে তখন প্রকৃত পশু খামারের মালিক ছিলো হেনরী হুকার। ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচারে বেশ কয়েক পাল পশু সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করে শেষে সালফার স্প্রিং ভ্যালিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে সে। সেও আঠারোশো আটানব্বই সালের কথা।

পুরোনো নথিপত্রে হিলটন, লকউড ও অন্যান্য খামার মালিকদের প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলো। কিন্তু টুমিদের কোনো উল্লেখ নেই।

ভূমি প্রশাসন দপ্তরেও সেই একই অবস্থা। এখানেও টুমিদের নামে কোনো জায়গা-জমির দলিলপত্র পাওয়া গেলো না। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করি সব সময়। মোটা একটা লোকের উপস্থিতি। তৃতীয় বারের মতো ভূমি প্রশাসন দপ্তরেও দেখা গেলো তাকে।

মোটেল থেকে বেরোবার সময় দেখলাম লবিতে। খবরের কাগজ পড়ছিলো লোকটা। লাইব্রেরি থেকে যখন বেরিয়ে আসি, লোকটা তখন রাস্তার মোড়ে। এখন এই ভূমি প্রশাসন দপ্তরে। চুটিয়ে গল্প করছে একজন লোকের সাথে।

ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। কিন্তু তেমনটা মনে হলো না আমার কাছে। মৃত লোকটা কেন দেখা করতে এসেছিলো, সেই সূত্র ধরে আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাও বিচিত্র কিছু নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে একজন সফল ব্যবসায়ী বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত একজন ব্যাঙ্কার।

তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলো মনটা। সত্যিই কি সে ফলো করছে আমাকে? একবার ভাবলাম কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করি লোক-

টার। কিন্তু তা না করে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। তারপর একটা বারে এসে বসলাম। বীয়ারের অর্ডার দেয়ার দু'মিনিট পরই দেখলাম, আস্তে আস্তে খুলে গেলো বারের সুইং ডোরটা। ভেতরে ঢুকলো সেই মোটকু। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা গিয়ে বসলো কোণের টেবিলটায়।

ড্রিংক এলো। এক চুমুক খেতেই দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে মোটকুটা। গিয়ে ঢুকলো টেলিফোন বুথে।

একটা তাড়া অনুভব করলাম ভেতরে ভেতরে। তাড়াতাড়ি গ্লাসটা শেষ করে উঠতে যাবো এমন সময় আবার খুলে গেলো সুইং ডোরটা। এবার ভেতরে ঢুকলো ছিপছিপে লম্বা এক লোক। সাদা স্যুটের সাথে ওয়েস্টার্ন স্টাইলের সাদা হ্যাট। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স। ঢুকেই পুরো বারটার ওপর চোখ বুলিয়ে এগুলো আমার দিকে। একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে বললো, 'ড্যান শেরিডান? আমি কলিন ওয়েলস। আরিজোনার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ এভারগ্রীনের মালিক। শুনেছি তুমি বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন রাইটার। আশাকরি আমার র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে কিছু লিখে ধন্য করবে আমাকে। এবং সেই সাথে আতিথেয়তার সুযোগটাও দেবে।'

আধুনিক র‍্যাঞ্চিং আর র‍্যাঞ্চারদের জীবন নিয়ে আলোচনা করলাম কিছুক্ষণ। কলিনও তার র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে ঝাড়া দশ মিনিট বক্তৃতা দিলো। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করে যেটুকু জানলাম, সত্যিই অবাক হলাম তাতে। এত বড় র‍্যাঞ্চের কথা কখনও শুনি নি আগে।

'যখন খুশি আসতে পারো তুমি,' বললো কলিন। 'যতদিন খুশি থাকতে পারো। সুন্দর একটা সুইমিং পুলও আছে ওখানে।'

'কোথায় র‍্যাঞ্চটা?'

'এখান থেকে পুবে। ভার্ডে নদীর পাশে। আমার ফোরম্যান এখন কেনাবাটা করছে শহরে। স্টেশন ওয়াগন নিয়ে ফিরে যাবে সে। তার সাথেই আসতে পারো।'

জন টুমির ডায়রিতে ভার্ডে নদীর কথাও উল্লেখ ছিলো। সুদূর টেক্সাস থেকে এই ভার্ডের উপত্যকায় এসেই প্রথম আস্তানা গেড়েছিলো ওরা। জায়গাটা দেখার লোভটা ছাড়তে পারলাম না কিছুতেই। ওখানে আসার পর কি ঘটেছিলো টুমিদের ভাগ্যে—হয়তো কিছু সূত্রও পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু জানি আমি, নব্বই বছর পর সে-সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ।

মোটেলের ঠিকানা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বার থেকে।

দুই

হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলেছে স্টেশন ওয়াগন। শক্ত হাতে হুইল ধরে রেখেছে ফোরম্যান। লোকটাকে মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। পরনের বেশবাসটাও ভালো নয়। ময়লা প্যান্টের সাথে বাফস্কিনের জ্যাকেট আর দুমড়ানো মুচড়ানো হ্যাট। হ্যাটটা পেছন দিকে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে সামনের বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমিটা দেখালো আমাকে।

'এখান থেকেই শুরু হয়েছে এভারগ্রীন র‍্যাঞ্চ। একেবারে ভার্জের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃতি এর।'

অ্যারিয়েল ফটোগ্রাফের ওপর গভীর মনোনিবেশ করে উত্তর পুবে স্কোয়া পিক এবং সিডার র‍্যাঞ্চ পাহাড়ের চূড়া দুটো চিনতে পারলাম। কিন্তু ম্যাজাটজালসের চূড়া চারটার মতো মনোরম নয় এ দুটো।

সূর্যের আলোতে চকচক করা দূরে একটা বাড়ি দেখালাম আঙুল তুলে। 'কি ওটা?'

'বার-বেল। জিমারম্যানের র‍্যাঞ্চ হাউস। মিস্টার কলিনের আত্মীয় উনি।'

পনেরোশো মাইল দূর থেকে যে মানুষগুলো পশুপাল নিয়ে এসেছিলো এই দেশে, তাদের কাছে জায়গাটা ছিলো স্বর্গের মতো। এমন দুঃসাহসিক কাজের জন্য দরকার হয় কালজয়ী পুরুষের। তৃষ্ণা, দুরন্ত আর অ্যাপাচিদের আক্রমণকে যারা ভয় পায় না, জীবনকে যারা বাজি রাখতে পারে তুচ্ছ জিনিসের কাছে, কেবল তারাই পারে এই দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নিতে।

ঢালু পথ বেয়ে নামার সময় আচমকা করলাম প্রশ্নটা। 'লস্ট রিভার এখান থেকে কত দূর?'

চট করে আমার মুখের দিকে তাকালো ফোরম্যান। 'লস্ট রিভার? কোথায় শুনেছো এ নাম?'

'মোটেলের লবিতে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো কয়েক জন।'

মুখটা কঠিন হলো ফোরম্যানের। 'নিশ্চয়ই বুড়োর দল। খুব বেশি লোকে জানে না নদীটার কথা।' আঙুল তুলে দূরের কতগুলো ঝোপঝাড় দেখালো সে। 'ওদিকে হিলো। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে

শুকিয়ে গেছে।' কথা বলতে বলতে নদীটার অবস্থান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো ফোরম্যান।

হঠাৎ খুব অস্থির বোধ করতে লাগলাম আমি। কেন এলাম এখানে নব্বই বছর আগের রহস্য উদঘাটন করতে? কি বোকা আমি! এর চেয়ে কম কষ্টে অনেক ভালো গল্প লিখতে পারতাম। এমনও হতে পারে, এখানে রহস্যজনক কোন কিছুই ঘটে নি।

আবার তাকালাম লস্ট রিভারের দিকে। আমার প্রশ্নের জবাব যে ওখানেই পাবো, তাই বা কি করে বিশ্বাস করি?

এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি নেই আমার। ম্যানুয়েলের মৃতদেহটা দেখার পর থেকেই একটা অজানা আশঙ্কায় ভুগছি। নদী-টার কথা জিজ্ঞেস করায় ফোরম্যান যে ভাবে তাকালো আমার দিকে তাতে আরও বেড়ে গেছে আশঙ্কাটা।

পুরো ঘটনাটার সূত্রপাত হয় নিউ অরলিন্‌সে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বিসলে কোল্ট পিওনা কেনার পর থেকে। ডায়রির কয়েকটা ছেঁড়া পাতা লুকানো ছিলো ওটার ব্যারেলের ভেতর। শক্তভাবে পাকানো অবস্থায় ছিলো পাতাগুলো।

এই পাতাগুলোই রহস্যময় দলিল। কে এগুলো লুকিয়েছিলো, কেনই বা লুকিয়েছিলো, টুমিদের রহস্যজনক নিরুদ্দেশের পর আরও ঘনীভূত হয়েছে সেই রহস্য।

জন টুমি লেখক ছিলো না। কিন্তু সে জানতো, এই ধরনের ড্রাইভ কখনও হবে না আর। তাই ভবিষ্যতের লোকদের জানার জন্যই ঘটনাটা লিখে রেখেছিলো সে।

বাজে গল্প মনে করে আমি এটাকে বাদ দিতে পারতাম। কিন্তু এমন কতগুলো টুকরো টুকরো ঘটনা এর সাথে জড়িত, যা আমি ছাড়া

অন্য কারও নজরে পড়ার কথা নয়।

টুমিরা ছিলো তিন ভাই। বড়টা মারা যায় কনফেডার‍্যাসি যুদ্ধে। জাতির ঐক্যের জন্য ক্লায়েড এবং জন টুমিও গিয়েছিলো উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে। কিন্তু ফিরে এসে মানুষের ঘৃণার পাত্রতে পরিণত হয় ওরা। বাধ্য হয় টেক্সাস ছাড়তে।

'আর কত দূর?' জানতে চাইলাম।

'তিন চার মাইল হবে। মিস্টার কলিনের বন্ধু তুমি?'

'না। আমি একজন লেখক।'

'কি লেখো তুমি?

'সীমান্তের পটভূমি। বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কাহিনী। তোমার নামটা কিন্তু জানা হয় নি এখনও।'

'রেসি····· ফ্লয়েড রেসি।'

লোকটার নামটাও পছন্দ হলো না আমার। নব্বই বছর আগে টুমিদের দলেও একটা লোক ছিলো এই নামে। অবশ্য প্রথম থেকেই ওদের সাথে ছিলো না লোকটা। আরিজোনা আসার পথে সান্তা ফে-র কাছাকাছি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় পশুপালের মধ্যে। বাড়তি কিছু লোক দরকার হয় এবং রেসিকে ভাড়া করে টুমি। কিন্তু লোকটা ছিলো ভীষণ মতলববাজ আর কলহপ্রিয়। সেই রেসির বংশধর কিনা এই রেসি—কে জানে!

'জন্ম কোথায় তোমার?' কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞেস করলাম।

'এখানেই। আমার বাবাও কাজ করতো এখানে।'

আরও কিছু টুকিটাকি কথা-বার্তার পর ফ্লয়েড রেসি সম্পর্কে যত-টুকু জানা গেলো তাতে মনে হয় এভারগ্রীন র‍্যাঞ্চেই ওর পৃথিবী শুরু এবং এখানেই শেষ।

এই ধরনের লোকের সাথে অনেক মেলামেশা করেছি আমি। বড়ও হয়েছি এদের সাথে।

প্রথম জীবনটা কেটেছে আমার ওয়েনিং র‍্যাঞ্চে। ওখানেই ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি। গরু চরিয়েছি।

যুদ্ধে যাবার আগে এক বছর কাজ করেছি খনিতে। যুদ্ধে ছিলাম মোট দু'বছর।

যুদ্ধের সময় বড়দিনে বাড়ি ফেরার কথা ছিলো আমার। কিন্তু তার আগেই আহত হয়ে ধরা পড়ি শত্রুর হাতে। জখমটা ছিলো খুবই মারাত্মক। পালাতে পারবো না এই বিশ্বাসে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে নি আমার। পালিয়ে যাই এই সুযোগে। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর একটা দিন হাঁটার পর আবার ধরা পড়লাম শত্রুর হাতে। বন্দীশিবিরে দেখা হয় পিয়োর সাথে এবং কৌশলে বেরিয়ে আসি দু'জন।

ফিরে ভর্তি হলাম গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ স্কুলে। সেই সাথে নিলাম সামরিক গোয়েন্দার প্রশিক্ষণ।

সামরিক গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করলাম এক বছর। তারপর আবার পাঠানো হয় যুদ্ধে। যুদ্ধরত অবস্থায় আহত হয়ে ধরা পড়ি এবং আবারও পালাই।

এতেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো, সামরিক জীবনে তামার সফলতা আসবে না। তাই ফিরে এলাম বেসামরিক জীবনযাত্রায় এবং পুরোপুরি ডুবে গেলাম লেখালেখিতে।

এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে এগোচ্ছে স্টেশন ওয়াগন। সামনেই একটা বাঁক। গাড়ির গতি কমালো রেসি। বাঁকটা ঘুরতেই দৃষ্টি পড়লো দু'জন লোকের ওপর। পাশাপাশি

ঘোড়ায় চড়ে আসছে ওরা। একজন বয়স্ক। রোগা পাতলা শরীর। গালের হাড় দেখা যাচ্ছে। অপরজন অল্প বয়স্ক। শক্ত সমর্থ। পোড় খাওয়া শরীর। দু'জনের হাতেই রাইফেল। কোমরে গুলির বেল্ট।

গাড়ি দাঁড় করালো রেসি ওদের পাশে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললো, 'এই আমাদের লেখক, ড্যান শেরিডান।' তারপর ঘাড় কাত করে তাকালো আমার দিকে, 'ড্যাড স্টাইল আর রিপ পার্কার। অনেক দিন কাজ করছে এখানে।'

গাড়ি চলতে শুরু করলো আবার। 'র‍্যাঞ্চে রাইফেল দিয়ে কি করে ওরা?' জানতে চাইলাম।

'চোর ছ্যাঁচ্ছড়ের পাছে ধাওয়া করতে হয় মাঝে মধ্যে। পুলিশের জন্য খুব দূর হয়ে যায় জায়গাটা। ওদের দায়িত্বটা আমাদেরই পালন করতে হয়।'

'কি চুরি করে ওরা?'

'গরু। ঘোড়ায় চড়ে প্রায়ই হানা দেয় পালে।'

'মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে কখনও?'

'অনেকবার। কে চায় ধরা দিতে?'

পথে আর কথা হলো না রেসির সাথে। সন্ধ্যার আগে একটা পাথুরে বাড়ির সামনে এসে থামলো স্টেশন ওয়াগন। লোকটাকে আর সহ্য হচ্ছিলো না আমার। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সাদা কোট পরা একজন মেক্সিকান এসে আমার স্যুটকেসটা বের করলো পেছনের সীট থেকে। কলিন এসে দাঁড়ালো দরজায় এমন সময়। হাতে ড্রিংকস। 'এভারগ্রীনে স্বাগত জানাচ্ছি। এসো রাইটার,

ভেতরে এসো।'

স্ল্যাক্স আর মেক্সিকান ব্লাউস পরা কুড়ি বাইশ বইয়ের অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে এসে দাঁড়ালো কলিনের পাশে। স্বর্ণকেশী। চোখ দু'টো স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি টানা। আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে মেয়েটা।

'আমার শ্যালিকা, বেলি ডসন' বললো কলিন। তারপর তাকালো বেলির দিকে। 'বেলি, এই সেই লেখক। একটু আগেই যার কথা বলেছিলাম তোমাকে।'

'মিঃ শেরিডান!' হেসে বললো বেলি। 'কি সৌভাগ্য আমার! প্রিয় লেখককে কাছে পেলে সব পাঠক পাঠিকাই খুশি হয়।'

'এবং উল্টোটা,' হেসে বললাম। 'কিন্তু ভয় নেই, তুমি আমার সবগুলো বই পড়েছো কিনা জানতে চাইবো না।'

'সবগুলো পড়েছি। অতীতকে ফুটিয়ে তোলার জুড়ি নেই, আপনার।'

'কাজটা সত্যি কঠিন। পুরোনো পত্রিকার ফাইল, ডায়রি, ক্যাটালগ ইত্যাদি ঘেঁটে ঘেঁটে এই দুরূহ কাজটা করতে হয় আমাকে।'

বেলির সাথে কথা বলতে বলতে তিনশো গজ দূরে পাথরের তৈরি একটা বাড়ির ওপর দৃষ্টি পড়লো আমার। জানালা নেই বাড়িটায়। ছোটো ছোটো কতগুলো ছিদ্র আছে শুধু। যা দিয়ে কেবল রাইফেলের ব্যারেল ঢুকতে পারবে। বাড়িটা দেখার সাথে সাথে টুমির ডায়রির কিছু অংশ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। 'অ্যাপাচিদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা দুর্গ তৈরি করি আমরা।'

'বাড়িটা আপনাকে খুব বেশি কৌতূহলী করে তুলেছে, মিস্টার শেরিডান,' বললো বেলি। 'আসলে ওটা পুরোনো জিন, লাগাম আর

যন্ত্রপাতি রাখার স্টোর। কলিনের পিতামহের আমল থেকেই আছে বাড়িটা।'

'শেরিডান,' এক পা এগিয়ে এসে বললো কলিন, 'এ জায়গা সম্পর্কে কিছু জানতে হলে বেলিকে জিজ্ঞেস করো। আমি যতটুকু জানি, বেলিও তাই জানে।'

নব্বইটা বছর। অনেক লম্বা সময়। কোনো সূত্র পাবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবু টুমি রহস্যের শেষ দেখতে হবে আমাকে। ঐ পুরোনো বাড়িটাও অনেকগুলো সূত্রের মধ্যে একটা। বিগত দিনের পশ্চিমা ইতিহাসের ওপর আমি এত বেশি গবেষণা করেছি যে অতীত আমার কাছে অতীত বলে মনে হয় না। বরঞ্চ অতীতকে আমি জীবন্ত ধরে রেখেছি বই পুস্তকের মধ্যে।

'একটা ড্রিংকস দিই আগে, মিস্টার শেরিডান। আসুন। খুব ক্লান্ত লাগছে আপনাকে।'

বেলির সাথে বাড়ির পেছন দিকে একটা বসার ঘরে এসে বসলাম। সুইমিং পুলটা দেখা যায় ওখান থেকে।

'মিস্টার শেরিডান, যত জলদি পারেন চলে যান এখান থেকে', গলা খাটো করে বললো বেলি। 'আই মিন টুমরো। যদি আপনি জ্ঞানী মানুষ হন—আগামী কাল সকালেই আরিজোনা ত্যাগ করুন।'

'কেন?'

'বই পড়ে আপনার প্রতি সুস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মেছে আমার। তাই অনুরোধ করছি, রাতটা শেষ হবার পর আর এক মুহূর্তও থাকবেন না এখানে।'

'আমার বইতে ক্ষতিকর কিছু থাকে না।'

'তা জানি। কিন্তু এখন যে বইটা আপনি লিখতে যাচ্ছেন সেটা

অনেকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। জানি না, কেন এখানে আসতে বলা হয়েছে আপনাকে। এমন কি আছে এখানে যা আপনার গল্পের পটভূমি হতে পারে। কলিন খুব অতিথি প্রিয়। কিন্তু বেশি নাক গলানো পছন্দ করে না সে।'

'কলিনের শ্যালিকা তুমি?'

'মিথ্যে কথা। আমার বড় বোনকে বিয়ে করেছিলো ওর ছোট্ট ভাই। গত বছর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা।'

আর দাঁড়ালো না বেলি। দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মেয়েটা? আমাকে সতর্ক করে দেয়ার পেছনে কি স্বার্থ আছে ওর? স্নায়ুবিকারগ্রস্ত? কিন্তু দেখে তো মনে হয় চতুর, বুদ্ধিমতী। যাহোক, অন্তত একটা ব্যাপারে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে মেয়েটা। কেন আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে এখানে? কলিন কি মনে করে আমি আসাতে ওর র‍্যাঞ্চের প্রচার বাড়বে? বেচাকেনা বেশি হবে? কিন্তু একটা কারণও মনপূত হলো না আমার। বরং অস্বস্তিকর অনুভূতিটা বেড়ে গেলো আরও।

মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভার্ডে নদী। যে সব পাহাড়ের কথা উল্লেখ আছে টুমির ডায়রিতে সেগুলোও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। নিশ্চিত হলাম, এই সেই জায়গা। ঠিক জায়গাতেই আমাকে এনেছে কলিন।

এতকিছু সত্ত্বেও চলে যেতে বলছে মেয়েটা। কিন্তু তা কি করে হয়? নব্বই বছরের পুরোনো রহস্য নিয়ে আমি ছাড়া আর কে মাথা ঘামাবে?

ঐ পাথুরে বাড়িটাই বেশি কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে। অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য হলেও ঢুকতে হবে ওখানে। বারবার মনে হচ্ছে, ওখানেই লুকিয়ে আছে টুমি রহস্য।

একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি চেপে ধরলো আমাকে। নানান ধরনের সন্দেহ উঁকি দিতে শুরু করলো মনের ভেতর। সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠলো বারবার।

মনো হলো ফ্লয়েড রেসির কথা। লস্ট রিভারের কথা জিজ্ঞেস করায় অমন চমকে উঠলো কেন সে? ভূমি প্রশাসন অফিসের সেই কেরানীটা? সে-ও চমকে উঠেছিলো টুমিদের কথা জিজ্ঞেস করায়। পরক্ষণেই পাশের রুমে গিয়ে কার সাথে যেন কথা বলেছিলো ফোনে, 'ইয়েস, টুমি। ছাটস রাইট···টুমি।' আর সেই মোটা লোকটা? ভূমি প্রশাসন অফিস, হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির লাইব্রেরি এবং মোটেলের লবিতে আঠার মতো লেগেছিলো সে। প্রত্যেকটা ঘটনাই যেন শেকলের মতো বাঁধা। অবিচ্ছিন্ন।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের পেছনে। তার লাল আভা এসে পড়েছে সুইমিং পুলে। পুলের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছে বেলি ডসন। পরনে বিকিনি। ধবধবে সাদা শরীর দেখা যাচ্ছে ওর। ডাইভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য একটা মেয়ে। স্বর্ণকেশী। বেলির চেয়ে প্রায় বছর দশেক বড় হবে বয়সে। তারও পরনে বিকিনি।

পুল থেকে একটু দূরে ইজি চেয়ারে বসে আছে কলিন। সামনে টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। পাশে গাট্টাগোট্টা আরও একজন লোক। পেছন ফিরে বসা। হঠাৎ মুখ নিচু করে কি যেন বললো কলিন। ঘুরে বসলো লোকটা। মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে এখন।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম আমি। সড়সড় করে একটা আতঙ্ক স্রোত বয়ে গেলো সমস্ত শরীরে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। পুলিশের লোক নয় সেই মোটকুটা। কলিনের।

বেলি এসে ঘরে ঢুকলো আবার। 'সাঁতার কাটবেন না?'

'না। তুমি যাও।'

'কিসের সংকোচ? আমি না ডোরি?'

'ডোরি? ঐ স্বর্ণকেশীটা? না-না, কাউকেই নয়। আসলে সাঁতারের ইচ্ছা নেই এখন।'

ডাইভিং বোর্ডের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ডাইভের প্রস্তুতি নিচ্ছে ডোরি। খাড়াভাবে মাথার ওপর দু'হাত তুলে দোল খাচ্ছে।

সাদা কোট পরা সেই মেক্সিকানটা ঢুকলো ঘরে। 'ড্রিংকস কি দেবো, স্যার?'

'ভোদকা আর টনিক।'

দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো মেক্সিকানটা। আরও কি যেন বলতে চাইছে সে।

'কি হলে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও?'

'শিওর, স্যার। ভোদকা আর টনিক।' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললো মেক্সিকানটা। অপ্রত্যাশিত একটা বন্ধুত্বের হাসি দেখতে পেলাম ওর চোখে মুখে।

'পুলে না গেলে খুব নিরাশ হবে কলিন,' বললো বেলি। 'পুলটা নিয়ে গর্বের অন্ত নেই ওর। ও চায়, সবাই এখানে এসে সাঁতার কাটুক। ওর পুলের প্রশংসা করুক।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বললো, 'শুধু সাঁতার নয়। ও চায়, সবাই সবকিছুতে অংশ গ্রহণ করুক।'

চট করে ডাইভিং বোর্ডের দিকে তাকালাম। হেসে বললাম, 'সব কিছুতে?'

পুলের দিকে না তাকিয়েই ঠাণ্ডা গলায় বললো বেলি, 'ওটা মিসেস

কলিন।'

'কলিন ভাগ্যবান মানুষ।'

কয়েকবার দোল খেয়ে খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেলো ডোরির শরীরটা। একটা পাঁক খেলো শূন্যে। তারপর মাথা নিচু করে তীর বেগে নেমে এলো পানিতে। সুন্দর ডাইভ। ভেসে উঠলো একটু পর। সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে ধীর পায়ে হেঁটে এলো বেলির কাছে। মিষ্টি করে হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে।

'আমি ডোরিস ওয়েলস। কলিনের কাছে শুনেছি তোমার কথা। কিন্তু এত সুন্দর দেখতে তাতো বলে নি কলিন?'

বেলি রক্ষা করলো আমাকে জবাব দেয়া থেকে। বললো, 'কদ্দিন থাকবেন এখানে, মিস্টার শেরিডান?'

'বলতে পারছি না। একটা গল্পের পটভূমি খুঁজছি। অ্যাপাচি যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু লেখার চিন্তা ভাবনা করছি।'

'তার মানে বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছা আছে,' বললো ডোরি। তারপর আঙুল তুলে দূরের কতগুলো পাহাড়ের দিকে দেখালো। 'মেজর র‍্যানডেল বেশ কিছু অ্যাপাচি সাঁদে ফেলেছিলো ওখানে। রক্ত-ক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিলো অ্যাপাচিদের সাথে।'

ইতিহাসটা জানা আছে আমার। এমন কি তারিখটাও মনে আছে। বাইশে এপ্রিল, আঠারোশো তেয়াত্তর। আগেভাগে খবর পেয়ে পাহাড়ের পাশে ওৎ পেতে বসেছিলো মেজর র‍্যানডেল। অ্যাপাচিরা পৌঁছামাত্র আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিলো অ্যাপাচিরা। কিন্তু জায়গাটা তাদের অনুকূলে না থাকায় বেশিক্ষণ টিকতে পারে নি র‍্যানডেলের দলবলের কাছে।

ড্রিংকস নিয়ে এলো মেক্সিকানটা। 'আপনার শোবার ঘর ঠিক করা

হয়েছে, স্যার। করিডোরের শেষ মাথায়। বাঁ দিকের ঘরটা।'

সুইমিং পুলের দিকে চলে গেলো ডোরি।

গ্লাসে ভোদকা ঢেলে তাকালাম বেলির দিকে। 'খুনটা সম্পর্কে কিছু বলেছে কলিন?'

চমকে উঠলো বেলি। 'খুন?'

'অ্যালভারেজ নামে একটা লোক খুন হয়েছে কাল আমার মোটেলের সামনে।'

মুখটা সাদা হয়ে গেলো বেলির। ঢোক গিলে বললো, 'পিয়ো?'

'না, ম্যানুয়েল। পিয়োকে মারা অত সহজ নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো বেলি। 'পিয়োকে চেনেন আপনি?'

'একসাথে ছিলাম সেনাবাহিনীতে। অমন হুঁশিয়ার আর জেদী লোক খুব কম দেখেছি আমি। পেছনেও দু'টো চোখ আছে ওর।'

ডানে বাঁয়ে সতর্কভাবে দেখে নিয়ে একটু ঝুঁকে এলো বেলি। ফিসফিস করে বললো, 'পিয়ো নামটা জনপ্রিয় নয় এখানে। আপনার সাথে পরিচয় আছে একথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। বিশেষ করে কলিন। কলিনের ধারণা কয়েক বছর ধরে অ্যালভারেজরাই চুরি করছে ওর স্যাঙ্কে। পিট অ্যালভারেজকে হাতেনাতে ধরেছিলো ওরা।'

সত্যিই চমকে উঠলাম এবার। 'তাহলে এখানেই খুন করা হয়েছিলো পিটকে?'

'হ্যাঁ ফ্লয়েড রেসি খুন করে ওকে।'

তিন

স্তব্ধ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য। স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা গোলমালে জড়িয়ে যাচ্ছি। আমার আরিজোনা ভ্রমণটা একটা দুঃস্বপ্নে রূপ নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

আমার সাথে দেখা করতে এসে খুন হয়েছে একজন। তার ছোটো ভাইকেও খুন করা হয়েছে এই র‍্যাঞ্চে। তৃতীয় ভাইটা ভীষণ এক-গুঁয়ে। বিপদ আঁচ করে হয়তো গা ঢাকা দিয়ে আছে কোথাও। বেরিয়ে আসবে সময় মতো। শুধু আমিই চলে এসেছি বিপদের কেন্দ্র-বিন্দুতে।

ঠিকই বলেছে বেলি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়া উচিত আমার। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমাকে এখানে ডেকে আনার পেছনে কি স্বার্থ আছে কলিনের? শুধুই কি র‍্যাঞ্চ দেখাবার উদ্দেশ্যে, নাকি অন্যকিছু?

চট করে একটা কথা মনে হলো। পরক্ষণেই বোকা ভাবলাম নিজেকে। নব্বই বছর আগে যা শেষ হয়ে গেছে তার সাথে কি সম্পর্ক থাকতে পারে এখনকার পরিস্থিতির?

'আগামীকাল যেতে চাইলে পৌঁছে দেবো,' নীরবতা ভাঙলো বেলি।

'ধন্যবাদ। কিন্তু যাবার আগে একটা রহস্যের গিঁট খুলতে হবে আমাকে।'

'গোলমাল পছন্দ করি না আমি, মিস্টার শেরিডান। গোলমাল শুরু হলে অনেক লোক মারা যাবে এখানে। কলিনের কথাই ধরুন। ছোটবেলা থেকে ওকে চিনি আমি। কাছেই লিটিল কগার র‍্যাঞ্চে জন্ম আমার। ওখানেই কেটেছে জীবনের প্রথম বারোটা বছর। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে বাবা আমাদের দু'বোনকে পাঠিয়ে দেন লস অ্যাঞ্জেলেস। পড়াশোনা শুরু করি ওখানে। বাবার মৃত্যুর পর দু'বোনই ফিরে আসি আবার। তার কিছুদিন পর অকি ওয়েলস এর সাথে বিয়ে হয় সিনথিয়ার।'

'তারপর থেকে ওখানেই আছো?'

'না। সিনথিয়ার বিয়ের পর আবার চলে যাই লস অ্যাঞ্জেলেস। ফিরে আসি ওর মৃত্যুর পর। ভেবেছিলাম বাবার র‍্যাঞ্চটাই নতুন করে গড়ে তুলবো। কিন্তু বাঁধ সাধলো কলিন।'

'কারণ?'

'রাস্তাঘাট ভালো নয়, নির্জন এলাকা, একা কোনো মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, এইসব অজুহাতে ওর র‍্যাঞ্চে চলে আসতে বলে আমাকে। কিছুদিন পর আমাদের র‍্যাঞ্চটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়।'

'বিক্রি করবে ওর কাছে?'

মাথা নাড়লো বেলি। 'কক্ষনো নয়। ওটা আমার স্মৃতি। তা ছাড়া সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনায় যেটুকু বুঝি, আমাকে আরও দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে কলিন।'

অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। 'ভেবেছিলাম পরস্পরের বন্ধু তোমরা।'

'ঠিক ধরেছো। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।'

কলিন এবং অন্য একটা লোককে এদিকে আসতে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টালো বেলি। বললো, 'দু'বছর আগে এই পুলটা তৈরি করে কলিন। ও নিজেও একজন ভালো সাঁতারু।'

ঘরে ঢুকলো কলিন। 'শেরিডান, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। আমার চাচাতো ভাই, মার্ক উইলসন। ঘোড়ার ব্যবসা করে।'

মুখ তুলে তাকালাম লোকটার দিকে। দু'টো সাপের চোখের সাথে চোখাচোখি হলো আমার। শরীরটাও দড়ির মতো পাকানো। বক্সার অথবা রেস্টলারদের যেমনটা হয়।

'কেমন আছো, রাইটার?' অবজ্ঞার সাথে বললো উইলসন। তারপর ফিরলো কলিনের দিকে। 'রেসির ওখানে যাচ্ছি।' যাবার আগে বেলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালো একবার। 'আবার দেখা হবে, খুকী।'

দাঁতে দাঁত চেপে উইলসনের দিকে তাকালো বেলি। ঘৃণা ঝরে পড়লো ওর দু'চোখে।

আমার পাশের চেয়ারটায় বসলো কলিন। 'র‍্যাঞ্চটা দেখতে হলে ঘোড়ায় চড়তে হবে তোমাকে, শেরিডান। অভ্যেস আছে তো?'

'আগে চড়েছি কয়েকবার।'

'গুড! তাহলে আগামীকাল সকালে বেরোবো আমরা।'

'শিওর।'

উঠে দাঁড়ালো কলিন। 'চলি, আস্তাবলে দেখা হবে কাল।'

'মিস্টার শেরিডান,' কলিন বেরিয়ে গেলে একটু নড়ে চড়ে বসলো বেলি। 'আপনি কি সত্যিই ঘোড়ায় চড়তে জানেন?'

'ওয়েমিং র‍্যাঞ্চে বড় হয়েছি আমি।'

'তবুও সাবধানে থাকবেন।' উঠে দাঁড়ালো বেলি।

সূর্য ডোবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইলাম একা একা। এলো-মেলো অনেক কিছু ভাবলাম। নব্বই বছর আগের রহস্যের সাথে পিট এবং ম্যানুয়েলের যে একটা যোগসূত্র আছে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। কি যোগসূত্র জানা নেই, কিন্তু আমিও যে জড়িয়ে গেছি সেই গোপন রহস্যের সাথে তাও বুঝতে বাকি নেই।

আরও একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছি। এখানে আসার পর কেউ আমার সাথে কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নি। একমাত্র বেলি ছাড়া সবার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি একটা উপেক্ষার ভাব। বেলিকেও মনে হচ্ছে বাইরের মানুষ। গুটিয়ে রেখেছে নিজেকে।

কেন আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে মেয়েটা? ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলো সেই কেরানীটা? শুরু থেকে ঘটনাগুলো সাজালাম আবার। এটাই সেই জায়গা। হতেই হবে। এখানেই লুকিয়ে আছে টুমি রহস্য। পাথুরে বাড়িটাও পাওয়া গেছে। বাকি শুধু ডায়রিতে উল্লে-খিত সঠিক জায়গাগুলো সনাক্ত করা। কালই বেরোবে। র‍্যাঞ্চটার নাড়ি নক্ষত্র জানে এমন একজন লোক দরকার। বেলি যদি যায় ভালো, নয়তো একজন গাইড নেবো সাথে।

কি হয়েছিলো এখানে নব্বই বছর আগে? অ্যাপাচিরা খুন করে-ছিলো সবাইকে? কোথাও কোনো রেকর্ড নেই। এমনও হতে পারে নিজের লোকরাই খুন করেছিলো টুমিদের। তবে যা কিছুই ঘটুক আচমকা ঘটেছিলো সবকিছু। এবং অক্ষত থাকবে মনে করে পিস্তলের নলের ভেতর ডায়রির পাতাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলো টুমি।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ধীরে ধীরে। দূরের পাহাড় আর ঝোপঝাড়গুলো দেখা যাচ্ছে না এখন। অন্ধকার আরও গাঢ় ওখানে। উঠে দাঁড়ালাম ধীরে ধীরে। অন্ধকার করিডোর ধরে এগোলাম রুমের দিকে। আমার

রুমটাও অন্ধকার।

ভেতরে পা দিয়েই থমকে গেলাম। মুহূর্তে টের পেলাম, আমি একা নই ঘরে। সহজাত একটা প্রবৃত্তি সাবধান করে দিলো আমাকে।

'নো লাইটস, সিনর।' অন্ধকারের ভেতর কে যেন ফিসফিস করে উঠলো। 'আমি পিয়োর বন্ধু, সিনর। পিয়ো পাঠিয়েছে আমাকে।'

'কি চাও এখানে?' ধমক লাগালাম চাপা গলায়।

'আমি অ্যামিগো। আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে এসেছি, সিনর। পিয়োর ধারণা, আপনাকে খুন করতে পারে এরা। খুব দুশ্চিন্তায় আছে ও।'

মাইক্রোফোন নেই তো রুমটায়? মনে মনে ভাবলাম, রুমটা আগেই ঠিক হয়েছে আমার জন্য। সুতরাং আড়িপাতার একটা যন্ত্র বসানো খুব সহজ এখানে। কে বসাতে পারে ওটা? কলিন? রেসি? তবে যেই হোক, সন্দেহটা যখন একবার উঁকি দিয়েছে মনের ভেতর, সাবধান থাকতে হবে।

দরজাটা ভেজিয়ে অন্ধকারে লোকটার কাঁধ স্পর্শ করলাম। গলা খাটো করে বললাম, 'এসো আমার সাথে।' বাথরুমে ঢুকে লাইট জ্বেলে খুলে দিলাম পানির ট্যাপটা। ঝরঝর শব্দ হতে লাগলো পানি পড়ার।

অ্যামিগোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললাম, 'আড়িপাতার যন্ত্র থাকতে পারে রুমে, তাই এ ব্যবস্থা। এবার বলো, কাকে দিয়ে বেশি ভয়।'

'সবাই! সবাই আপনার শত্রু! যত জলদি পারেন চলে যান, সিনর!'

'পিয়ো জানলো কি ভাবে আমি এখানে আছি?'

'একটু আগে যে মেক্সিকানটা আপনাকে ড্রিংকস দিয়ে গেলো, সে

আমার ছোট ভাই। তার কাছেই শুনেছি। আমিও কাজ করি র‍্যাঞ্চে। কিন্তু হেড কোয়ার্টারে আসার অনুমতি নেই আমার। পিয়োর অনুরোধে লুকিয়ে এসেছি।'

'আরও একটা কথা, জন টুমির নাম শুনেছো কখনও?'

'আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার।' অবাক হলো অ্যামিগো। 'আমি তো ভেবেছিলাম...'

হঠাৎ চুপ করে গেলো অ্যামিগো। অস্পষ্ট একটা পায়ের শব্দ শোনা গেলো করিডোরে। কেউ আসছে এদিকে। আস্তে আস্তে কাছে আসছে শব্দটা।

ছিটকে বেরিয়ে এলাম ট্যাপটা বন্ধ করে। অ্যামিগোকে থাকতে বললাম ওখানে। দ্রুত স্যুটকেস খুলে ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটা বের করে ডিকটেটিং শুরু করলাম। 'মেরী, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ লাইন তিনটা কেটে পৃষ্ঠাটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রেখো। কিছু রদবদল করতে হবে ওখানে। পঞ্চম অধ্যায়ের মাঝামাঝি জায়গায়, যেখানে ম্যাকাও সম্পর্কে লেখা হয়েছে সে পৃষ্ঠাটাও চিহ্ন দিয়ে রেখো। ওখানে রেড চায়নাদের সম্পর্কে আরও বিশদ কিছু লেখার ইচ্ছা আছে। রেড চায়নাদের নিয়ে গত কয়েক বছরের পত্র পত্রিকায় যে সব নিবন্ধ লেখা হয়েছে, পত্রিকা অফিসে গিয়ে সেগুলো যোগাড় করবে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি আসছি আমি। শুক্রবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে প্রকাশকের সাথে।'

ডিকটেটিং শেষ করে তাকালাম দরজার দিকে। ডান হাতে দরজার নব ধরে দাঁড়িয়ে আছে কলিন। চোখে মুখে কঠিন ভাব। টেপ রেকর্ডারটা দেখছে সে।

'মাফ করবেন, মিস্টার কলিন। মরারও সময় নেই লেখকদের।

অফিস আদালতে যারা চাকরি বাকরি করে ছুটির পর অফিসের কাজ অফিসেই ফেলে আসে। বাড়ি পর্যন্ত বয়ে আনে না। কিন্তু লেখকদের সে সুযোগটা নেই। যেখানেই যাক, লেখাটা ঘুর ঘুর করতে থাকে মাথার ভেতর। আমার কি দেরি হয়ে গেলো ডিনারে?'

জবাবের অপেক্ষা না করে আবার তুলে নিলাম মাইক্রোফোনটা। 'মেরী, শেষের সংলাপটা মুছে দিয়ো। ওটা কোনো রম্য নাটকের সংলাপ নয়।'

দরজায় দাঁড়িয়েই কঠিন দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলালো কলিন। বাথরুমের দিকেও তাকালো একবার। 'তোমার থাকার ব্যবস্থা কেমন হলো দেখতে এলাম। বয় বেয়ারা দিয়ে বিশ্বাস নেই। অনেক সময় বিছানার চাদর পর্যন্ত পাল্টাতে ভুলে যায় ওরা।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো কলিন। তারপর বললো, 'ও হ্যাঁ, ডিনার রেডি। শহরের চেয়ে আমরা কিছুটা আগেই খাই।'

দরজা ছেড়ে করিডোর ধরে এগোলো কলিন। রেকর্ডারটা বন্ধ করে অনুসরণ করলাম ওকে।

নিশ্চিত হলাম এবার। আড়িপাতার যন্ত্র আছে ঘরে। কে আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে তাকে ধরার জন্যই এসেছিলো কলিন। কিন্তু টেপ রেকর্ডারটা বোকা বানিয়েছে ওকে।

বড়সড় একটা ডাইনিং রুমে ঢুকলাম আমরা। ঝাড় বাতির উজ্জ্বল আলোয়ে ভেসে যাচ্ছে রুমটা। দেয়ালে বড় বড় ব্রাসের প্লেটে মধ্য-যুগীয় চিত্রাঙ্কন। আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওগুলো।

বড় টেবিলটা ঘিরে বেলি, ডোরি ও মার্ক উইলসন ছাড়া আরও দুজন লোক বসা। অচেনা। বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে খাবার নিয়ে।

'আমার নিজের লোকেরা তৈরি করেছে বাড়িটা,' ডোরির পাশে

বসতে বসতে বললো কলিন। 'আমিও দিনরাত খেটেছি ওদের সাথে। কেউ এটাতে ভাগ বসাতে এলে আমি তার হাত কেটে ফেলবো। কেউ পারবে না। কেউ না।'

বেলির মুখোমুখি বসে বললাম, 'রিয়াল স্টেটের লোকদের দূরে রাখতে পারলে তবেই।'

চট করে আমার মুখের দিকে তাকালো কলিন। 'কথাটার অর্থ?'

বেলি হস্তক্ষেপ করলো মাঝখানে। 'মিস্টার শেরিডান, লস অ্যাঞ্জেলেস এর মতো আরিজোনার দালালরা ততটা খারাপ নয়। এখানে জায়গা জমি নিয়ে কলহ হতে শুনি নি কখনও।'

'শুরু করো এবার,' বললো কলিন। 'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব।' তারপর তাকালো আমার দিকে। 'এক্সকিউজ মি রাইটার। ওদের সাথে এখনও পরিচয় হয় নি তোমার। নীল জ্যাকেটটা আমার ছোট ভাই, জিম্বো ওয়েলস। নামটা শুনেছো হয়তো। আর ওটা জিমারম্যান। আমাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়।'

খেতেখেতে চিন্তার ঝড় বইছে আমার মাথায়। রিয়াল স্টেটের প্রসঙ্গ তুলতে ওভাবে চমকে উঠলো কেন কলিন? কিসের ভয় করছে সে? তবে কি র‍্যাঞ্চের স্বত্ব নিয়ে বিরোধ আছে কারও সাথে?

যদি তাই হয়, কলিনের উদ্বেগের কারণ আছে বৈকি। র‍্যাঞ্চ এবং এর লাগোয়া সম্পত্তির মূল্য কম করে হলেও কয়েক মিলিয়ন ডলার।

ম্যানুয়েলের খুনের সাথে কি সম্পর্ক আছে এই র‍্যাঞ্চের। পিট অ্যালভারেজ খুন হয়েছে এখানে। চুরির দায়ে। নয়তো এমন গোপন কিছু জানতো সে, যার ফলে খুন হতে হলো তাকে। কি সেই গোপন রহস্য? এমন হতে পারে, এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল টুমিরা। কলিনের পূর্ব পুরুষরা যেভাবেই হোক ওদের উচ্ছেদ করে জবর দখল

করে র‍্যাঞ্চটা। ওয়েলস পরিবার যদি এটা বিক্রির চেষ্টা না করে, এর আসল মালিকানা অনুসন্ধান করতে যাবে না কেউ।

খেতে খেতে বারবার দেখলাম জিম্বো ওয়েলসকে। শক্ত সমর্থ আর আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। না চিনলেও নাম শুনেছি। আন্তঃকলেজ শটপুটে আগের রেকর্ড ভেঙেছে জিম্বো। ফুটবলও ভালো খেলে। কিন্তু যুদ্ধংদেহী স্বভাবের জন্য ক্রীড়াঙ্গনে কুখ্যাতি আছে ওর।

'এই প্রথম একজন লেখক দেখলাম এখানে,' সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো জিম্বো। আসন্ন বিপদের আভাস দেখতে পেলাম ওর দৃষ্টিতে।

'তোমাদের কলেজে একবার দেখেছিলে আমাকে।'

'হতে পারে। কিন্তু এমন বিশেষ কেউ নও তুমি যে মনে রাখতে হবে।' কটূক্তি করলো জিম্বো।

গা জ্বলে গেলো আমার। ইচ্ছা হলো শক্ত একটা ঘুসি বসিয়ে দিই জিম্বোর চোয়ালে। কিন্তু আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় গলা টিপে মারলো ইচ্ছা-টাকে। জিম্বোদের এলাকা এটা। এখানে ক্ষতি স্বীকার না করে জয়ের সম্ভাবনা নেই। শুধু আস্তে করে বললাম, 'কে বলেছে তোমাকে মনে রাখতে?'

খাওয়া বন্ধ করে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো জিম্বো। যেন ভস্ম করে ফেলবে আমাকে। কাটাচামচটা শক্ত করে ধরলো হাতের মুঠোয়।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ধমকে উঠলো কলিন। 'চুপ করো জিম্বো। শেরিডান আমাদের মেহমান।'

কলিনের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো জিম্বো। বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

'ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি,' বললো কলিন। 'ছোটোবেলা থেকেই

ও একটু বেয়ারা। কিছু মনে করো না। তুমি বরং গল্প শোনাও আমাদের। ধরো, এই র‍্যাঞ্চটা নিয়েই একটা গল্প লিখতে বলা হলো তোমাকে। কিভাবে শুরু করবে?'

কথা বলার মুড ছিলো না আমার। কিন্তু এই র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে বলতে হবে শুনে খুশি হলাম। গল্প বলার ছলে এদের প্রতিক্রিয়াটা জানা যাবে। নতুন কিছু সূত্রও হয়তো বেরিয়ে যেতে পারে। শুরু করলাম, 'যে কোনো র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে লিখতে বলা হলে প্রথমে আমাকে জানতে হবে তার ইতিহাস। লেখা শুরু করার আগে যেতে হবে সেখানে। ঘুরে দেখতে হবে চারপাশটা। জানতে হবে গোড়া-পত্তনের ইতিহাস। এমন ইতিহাস নয়, যা সবাই জানে। বরং সেই ইতিহাস, যা সবাই ভুলে গেছে আজ। প্রথম কারা এসেছিলো এখানে, কি পরিণতি হয়েছিলো তাদের, সেই ইতিহাস।'

টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ের ওপর চাপ দিলো বেলি। বুঝতে পারছি, আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে ও। নিষেধ করছে আর না এগোতে। কিন্তু আমাকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। আড়চোখে বেলির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে শুরু করলাম আবার। 'ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় টেক্সানরাই প্রথম আসে এখানে। সুতরাং জানতে হবে কোন্ পরিবার বসতি স্থাপন করে প্রথম। খুঁজে বের করতে হবে তাদের বংশধরদের। কথা বলতে হবে তাঁদের সাথে। ঘাঁটতে হবে পুরোনো নথিপত্র। জানতে হবে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিলো তাদের।'

প্লেটের একটা স্টেক্ নাড়াচাড়া করছে কলিন। খাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। পড়তে চেষ্টা করছে আমার মনের কথা। 'তোমার কি মতামত, শেরিডান? কি হতে পারে তাদের?'

'যেখানে সম্পদ আছে সেখানে খুনীও আছে।'

'এবং খুন করে লাশ গুম করার মানুষও আছে,' হেসে বললো কলিন।

হাত মুছে উঠে দাঁড়ালো ডোরি। 'চলো বসার ঘরে যাই। কফিটা ওখানেই খাবো।'

বসার ঘরে এলাম সবাই। কফি এলো একটু পর। নিয়ে এলো সাদা কোট পরা সেই মেক্সিকানটা। চোখেমুখে একটা প্রসন্ন ভাব। একটু আগে আমার কথাগুলো শুনেছে ও।

'এখানে একটা জিনিস দেখার অনেকদিনের সখ আমার,' এক চুমুক খেয়ে বললাম, 'অ্যাপাচিদের গুহাচিত্র। একজন গাইড দেবেন সাথে।'

'সুন্দর গুহাচিত্র আছে এখানে,' বললো কলিন। 'গাইড লাগবে না। আমরা সবাই যাবো দেখতে।'

ওরা সবাই যাবে শুনে মনে মনে দমে গেলেও মুখে হাসি টেনে বললাম, 'অবশ্যই যাবো।' কাপটা খালি করে উঠে দাঁড়ালাম। 'মাফ করবেন। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। কাল রাতে মিস্টার রেলি ডেকে তোলার পর ঘুম হয় নি আর।'

'রেলি? কে সে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো ডোরি।

'সার্জেন্ট রেলি। একটা খুনের তদন্ত করছে সে। ম্যানুয়েল অ্যালভারেজ নামে একজন লোক খুন হয়েছে আমার মোটেলের সামনে।'

কলিনের সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো ডোরি। তারপর বললো, 'তোমাকে ডেকে তুললো কেন?'

'আমার আরিজোনা আসা সম্পর্কে একটা পেপার কাটিং ছিলো লোকটার পকেটে। অ্যাপয়েন্টমেন্টও করেছিলো সে আমার সাথে।

কিন্তু দেখা করার আগেই খুন হয় লোকটা।'

'তুমি চিনতে ওকে? কথা বলেছো কখনও?'

'না। খুন হবার পরই প্রথম দেখেছি। কিন্তু সার্জেন্ট বোধহয় বিশ্বাস করছে না আমাকে। যেখানেই যাই জানিয়ে যেতে বলেছে। এখানে আসার আগে একটা নোট রেখে এসেছি তার জন্য।

চমৎকার ডিনারের জন্য ডোরিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

করিডোরে আসতেই দ্রুত পাশে এসে দাঁড়ালো বেলি। 'আপনি·· তুমি বোকা ড্যান। কাল পাহাড়ে নিয়ে তোমাকে খুন করবে ওরা।'

'বোকার মতো কথা বলো না, বেলি।'

'পাহাড়ী ট্রেইলে একটা ভুল স্টেপ ফেললেই সোজা পাঁচশো ফুট নিচে পড়বে। খুনের তদন্তও হবে না।'

'কি যা তা বলছো!'

'সত্যি কথাই বলছি, ড্যান। সরকারী উঁচু মহলে কলিনের দারুণ প্রভাব। দু'হাতে টাকা ওড়ায় ইলেকশনের সময়। তাছাড়া সে নিজেও একজন ডেপুটি শেরিফ। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, এই অ্যাক্সিডেন্টের তদন্তভারটা তাকেই দেয়া হয়েছে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'কি বলছি তবে। পাহাড়ী ট্রেইলে ঘোড়া চালাতে জানে না এমন একজন আনাড়ি ঘোড়সওয়ারের দুর্ঘটনা হিসেবে রিপোর্ট পেশ করবে কলিন। বলবে, খরগোস অথবা কয়োটি দেখে ভয়ে লাফ দেয় ঘোড়াটা এবং পা ফসকে পড়ে যায় নিচে।'

'টম রেলি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওকথা।'

'এটা শহর নয়, ড্যান। টম রেলির কর্তৃত্ব নেই এখানে।'

আর তর্ক করলাম না বেলির সাথে। শুভরাত্রি জানিয়ে ফিরে এলাম ঘরে।

শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, একটা জিনিস কেউ ভেবে দেখে নি ওরা। ম্যানুয়েলের মতো অখ্যাত একজন লোক খুন হলে হৈ চৈ না হবারই কথা। কিন্তু আমার বেলায় ঘটবে তার উল্টোটা। খবরের কাগজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আমার লক্ষ লক্ষ পাঠক পাঠিকা ; সবাই উঠে পড়ে লাগবে প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য।

তবুও সাবধান থাকতে হবে আমাকে।

চার

এলাকাটা বেশ উঁচু। চলে গেছে এভাবে অনেক দূর। তার ওপর প্রচণ্ড রোদে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পথ হয়েছে বিপদসংকুল। সেই বিপদসংকুল পাহাড়ী ট্রেইল ধরে চলেছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। সবার আগে ফ্লয়েড রেসি। ঠিক পেছনে কলিন ও ডোরি। তারপর একটা হ্যামার হেডেড ঘোড়ায় আমি। পাশাপাশি বেলি। সবার পেছনে জিম্বো ওয়েলস। জিম্বো আর রেসির সাথে রাইফেল।

সবচেয়ে ভালো ট্রেইলটা অনেক—অনেকদিন আগের। ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু ট্রেইলটার দু'পাশে পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি সরাসরি ল্যাণ্ডমার্ক দেখে বোঝা যায়, অনেকদিন আগে মানুষের চলাচল ছিলো এ পথে। পদ্ধতিটা প্রাচীন হলেও এ ধরনের ট্রেইল তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়ায় দেখা যায়। কবে এবং কারা প্রথম এ পথে চলাচল শুরু করে কে জানে!

ট্রেইলের দু'পাশে অনেক গর্ত। লোকেরা গুপ্তধনের আশায় খোঁড়াখুঁড়ি করে সৃষ্টি করেছে এসব গর্তের।

অলসভাবে কয়েকটা শকুন উড়ছে অনেক ওপরে। ওদের অভি-জ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানে ওরা জানে, ট্রেইল থাকলেই সেখানে মানুষ চলাচল করে আর মানুষ চলাচল করলে প্রায়ই সেখানে ঘটে মৃত্যু। পাওয়া যায় খাবার।

সূর্য এখনও পুবে। পাহাড়ের ওপাশে। নীরবে চলেছে সবাই। শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের ছন্দময় শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে আরও খারাপ জায়গায় এসে পড়লো ট্রেইলটা। খুব সাবধানে চলতে লাগলাম। প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চেই কম পক্ষে একটা করে খারাপ ঘোড়া থাকে। নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্বভাব থাকে সে-গুলোর। একটা কৌতুক প্রচলিত আছে এখানে—নতুন কোনো মেহমান বেড়াতে এলে বিশেষ ঘোড়াটাই দেয়া হয় তাকে। বুঝতে পারছি, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

মনে মনে ভাবলাম, আমাকে মারার ইচ্ছা থাকলে খারাপ একটা ঘোড়া দিয়ে মারাই হবে সহজতম উপায়। এক্ষেত্রে কিছুই থাকবে না প্রমাণ করার। এমন কি পাগলা ঘোড়াটার কথাও বেমালুম চেপে যাবে ওরা।

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে ট্রেইলটা। মিশেছে গিয়ে মেসার সাথে। এ পর্যন্ত ভীতিজনক কোনো কাণ্ড ঘটায় নি ঘোড়াটা। তবুও সন্দেহটা দূর করতে পারছি না মনের। প্রতিটা মুহূর্তেই আশংকা করছি কিছু একটা ঘটে যাবার।

জিম্বো ওয়েলস পেছনে থাকাতে আরও উদ্বিগ্ন আমি। ভেতর থেকে কে যেন সতর্ক করে দিচ্ছে বারবার। বিপদ যদি আসে, কলিনের কাছ থেকে আসবে না সেটা। আসবে জিম্বো অথবা রেসির তরফ থেকে। ঠাণ্ডা মাথায়, দক্ষতার সাথে রেসি তার কাজ শেষ করবে। আর জিম্বো করবে নিখাদ আনন্দের সাথে। কেন না শুরুতেই আমাকে সহ্য করতে পারে নি সে।

বেলির ঘোড়াটা আরও কাছ ঘেঁষে এলো আমার।

'সাবধান!' গলা খাটো করে বললো ও। 'খুব সাবধানে থেকো ড্যান।'

'সাবধানেই আছি। তবুও কিছু ঘটেই যদি যায়, তোমার তো একটা সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। তুমি তো ওয়েলস পরিবারের কেউ নও।'

'তা পাবে। আমাকে মারার ইচ্ছা নেই ওদের

'তোমাদের র‍্যাঞ্চটা কিনতে চাইছে কেন ও?'

আশেপাশে সবকিছুর মালিক হতে চায় কলিন। অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে র‍্যাঞ্চটা কেনার। এমন কি আমার বোনের অংশটাও কিনতে চাইছে।'

'তোমরা দু'জনেই মালিক ওটার?'

'হ্যাঁ।'

'সিনথিয়ার মৃত্যুর পর অংশটার কি হলো?'

'আমার মধ্যে এসে যায়। বাবা ওভাবেই করেছিলেন উইলটা।

সিনথিয়ার কোনো সন্তান থাকলে তারাই হতো ওর অংশের অংশীদার।'

'উইলটার কথা জানে কলিন ?'

'না।'

হঠাৎ একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আমার। নতুন একটা ক্ষুরের ছাপ। কিছুক্ষণ আগে পড়েছে ছাপটা। ছাপটা ভিন্ন রকম। ট্রেইলের ধার ঘেঁষে গেছে কেউ। ঘোড়সওয়ার যেই হউক, খুব সাবধানী লোক। একটু পরপরই ঘোড়া থামিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছে। অর্ধবৃত্তাকারে ঘোড়া ঘুরিয়েছে সে। ঘোড়াটাও চঞ্চল স্বভাবের। দাঁড়িয়ে থেকেও নাচানাচি করেছে। অনেকগুলো ছাপ পড়েছে সেখানে।

'এই ট্রেইলটা কি প্রায়ই ব্যবহার করা হয় ?' জানতে চাইলাম।

'কদাচিৎ। যারা ওপাশে রিংকনে (স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ নিভৃত আরামদায়ক জায়গা। পানি আর ছায়া আছে) অথবা নতুন পাহাড়ে যেতে চায় তারাই ব্যবহার করে এটা। নতুবা আমাদের এলাকা কগার পর্যন্ত জীপ ট্রেইল আছে একটা, সেটাই ব্যবহৃত হয়।

আগের ঘোড়সওয়ার তাহলে রিংকন অথবা নতুন পাহাড়েই গেছে। কিন্তু কি আছে ওদিকে ? কে সেই ঘোড়সওয়ার ?

চট করে পিয়ো অ্যালভারেজের কথা মনে হলো আমার। আগের ঘোড়সওয়ার পিয়ো নয়তো ? গতরাতে একবার সতর্ক করে দিয়েছে সে। আজ আবার কি বোঝাতে চাইছে আগে আগে থেকে ? নিশ্চয়ই কিছু একটা মতলব আছে ওর। পিয়োকে ভালোভাবেই চিনি আমি। শেয়ালের মতো ধূর্ত আর নেকড়ের চেয়েও হিংস্র। দু'দুটো ভাই খুন হয়েছে ওর। একজন এই র‍্যাঞ্চে। খুনের বদলা নিতে ও যে কলিনের

আশেপাশেই থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক।

জিমারম্যান সকালে তার র‍্যাঞ্চে চলে গেছে। কিন্তু মার্ক উইলসন? সে কোথায়?

হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেলো মেরুদণ্ড বয়ে। দেরিতে হলেও বুঝলাম, যা কিছুই ঘটুক কারও সাহায্য পাবো না এখানে।

এই গোচারণ ভূমির মাইলের পর মাইল সবই ওয়েলস পরিবারের। এটা ওদের পৃথিবী। এখানে যারা কাজ করছে তারাও ওদের লোক। শুধু একা আমি হচ্ছি অনধিকার হস্তক্ষেপকারী।

পালাবার পথ খুঁজতে লাগলাম যেতে যেতে। যেভাবেই হোক পালাতে হবে। জিনের রেকাবে পায়ের সামনের অংশটুকু রেখে সতর্ক হয়ে আছি। ঘোড়াটা পাগলামী শুরু করলেই লাফিয়ে পড়বো জিন থেকে।

আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে মেসা থেকে নেমে এলাম ছোট্ট একটা উপত্যকায়। অ্যারিয়েল ফটোগ্রাফের সাহায্যে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, উপত্যকাটা পেরিয়ে উত্তর পশ্চিমে কপার ক্রীক পর্যন্ত গেছে ট্রেইলটা।

এখনই সময়। কিছুক্ষণ বোঝাপড়া করলাম মনের সাথে। একবার কপার ক্রীক পাহাড়ের ওপাশে যেতে পারলে খুঁজে পাবে না আমাকে। তারপর শহরে গিয়ে রেলিকে জানাবো সবকিছু।

কিন্তু কি জানাবো! কি জানি আমি যা স্ট্যাণ্ড করবে কোর্টে? নিরপরাধ একজন লেখককে র‍্যাঞ্চে দাওয়াত করে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলো কলিন, একথা মাথা খুঁড়লেও বিশ্বাস করবে না কেউ। এমন কি ম্যানুয়েল অ্যালভারেজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো

তাও বিশ্বাস করবে না।

আমার সঙ্গে দেখা না হোক এ জন্যই কি খুন করা হলো ম্যানুয়েলকে? কি বলতে চেয়েছিলো ম্যানুয়েল?

বার বার একটা সন্দেহ ঘুর ঘুর করতে লাগলো মনের ভেতর। নিশ্চয়ই ওয়েলস পরিবারের গোপন কিছু জানতো পিট অ্যালভারেজ। যার ফলে সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাদের কাছে। পিট খুন হবার পর পিয়োর নির্দেশে ম্যানুয়েল বোধ হয় সেই গোপন কথাটাই বলতে এসেছিলো আমার কাছে।

হঠাৎ লাগাম টেনে জোর করে ঘোড়া থামালো রেসি। সামনে একটা ঝোঁপের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে উঠলো, 'কি যেন নড়তে দেখলাম ওখানে!' পেছনে লাইন করে দাঁড়ানো সবাই শুনলো ওর কথা।

'বুনো জানোয়ার·· সম্ভবত খরগোস টরগোস হবে,' বললো কলিন।

'মানুষের মতো মনে হলো।'

'হতে পারে।' তর্ক না করে বললো কলিন।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ানোয় খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো আমার ঘোড়াটা। পা ছোড়াছুড়ি করতে লাগলো অস্থিরভাবে। পালাবার এই অপূর্ব সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাইলাম না। লাগাম টেনে ধরে একটু সরিয়ে দাঁড় করলাম ঘোড়াটা। হঠাৎ যদি ওটা পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে, তা যেন আকস্মিকভাবেই ঘটেছে বলে ধরে নেয় ওরা।

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। আবার ঘোড়া ছোটালো রেসি। রাইফেলটা এখন ওর হাতে।

কিছুদূর যাবার পর পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলো জিম্বো। 'ভয় করছে, লেখক? পাহাড়ী ট্রেইলে পড়ে যাবার ভয়

পাচ্ছো ?'

জিম্বোর ব্যঙ্গোক্তি শুনে ঘুরে তাকালাম। বললাম, 'কলোরাডোর সান জুয়ানস অথবা ওয়েমিং এর বিগহর্নের কাছে এটা সমতল ভূমিতে···।'

'কি করতে ওখানে ?'

'আমি যখন গরু চরাতাম ওখানে, তুমি তখন ঘোড়ায় চড়তেও শেখো নি।'

জবাবটা নীরবে হজম করলো জিম্বো। একটা কথাও বললো না আর।

আবার থামতে হলো আমাদের। ট্রেইলের পাশে ঝুঁকে কি যেন দেখছে রেসি আর কলিন। পেছন থেকে জিম্বোও এগিয়ে গেলো সেদিকে। তারপর আমি। ওদের দৃষ্টি বরাবর তাকিয়ে দেখলাম, ভেজা মাটি আর পাথর দিয়ে একটা তীর চিহ্ন তৈরি করেছে কেউ। নিচে পাথর ঘষে লেখা : ফক্স—থারটি এইট।

'কি অর্থ এর ?' জানতে চাইলো কলিন।

'আমি সাইন বলে মনে হচ্ছে,' অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললো রেসি।

'কোনোদিনও আমি ছিলো না এখানে,' দৃঢ়ভাবে বললো কলিন। 'তাছাড়া দেখছো না, একেবারে নতুন সাইন।'

একমাত্র আমি জানি, কিসের সাইন ওটা। থারটি এইট ইনফ্যান্ট্রির ফক্স কোম্পানীতে অনেকদিন ছিলাম আমি আর পিয়ো। শত্রুর জন্য ত্রাস ছিলো এই কোম্পানীটা। পিয়ো জানে, সাইনটার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে না আমার। দুটো অর্থ হতে পারে তীর চিহ্নের। হয় পিয়ো ওদিকে আছে, নয়তো আমাকে যেতে বলছে ওদিকে।

একটা ভীতি সঞ্চার করতে চাইলাম ওদের মধ্যে। গায়ে পড়ে বললাম, 'রেসির ধারণা ঠিক হলে বিপদ হতে পারে আমাদের। ওটা যদি সত্যিই থারটি এইট ইনফ্যানট্রি-ফক্স কোম্পানীর সাইন হয়, তাহলে জানবেন, আমাদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে ওদের সেরা কোনো বন্দুকবাজ। ভিয়েতনাম যুদ্ধে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলো এই কোম্পানীর যোদ্ধারা।'

আমার কথা শুনে ফিকফিক করে হেসে উঠলো জিম্বো। কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে গেলো সে। 'আমাদের লেখক নাকি ওয়েমিং এর বিগহর্নে গরু চরাতো।'

কথাটা বিশ্বাস করলো না কেউ। আমার সম্পর্কে ওদের যে একটা ধারণা, তার সাথে মিল খুঁজে পেলো না কথাটার।

'আমাদের আগে একজন ঘোড়সওয়ার এসেছে এদিকে,' বললাম। 'সম্ভবত সে-ই তৈরি করেছে সাইনটা। কিন্তু এখানে সময় নষ্ট করছি কেন আমরা? গুহাচিত্র দেখে সন্ধ্যার আগেই শহরে ফিরবো আমি।'

'এসে গেছি প্রায়,' অন্যমনস্কভাবে বললো রেসি। তার চোখ তখন তীর চিহ্নিত উঁচু ট্রেইলটার দিকে। উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কোথায়, কতদূর গেছে ওটা। 'এগোন আপনারা, বস। ট্রেইলটা দেখে আসছি আমি।'

'আমিও যাই ওর সাথে।'

'দরকার নেই,' রাগতভাবে বললো কলিন। 'বিপদ হতে পারে।' রেসির চলে যাওয়া দেখলো সে। তারপর পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'কাম অন। 'আগের ট্রেইল ধরে ছুটে চললাম আমরা।

আধ মাইল যাবার পর চড়াই শুরু হলো আবার। বাঁয়ে লিটিল কগার। ডানে কুকস্ মেসা। প্রায় হাজার ফুট উঁচু।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো পেছনে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরও একটা। জিনের ওপর একহাত লাফিয়ে উঠলো কলিন।

'কলিন!' পেছন থেকে উত্তেজিত গলা শোনা গেলো জিম্বোর 'থেমো না! শিগগির পেরোও পাহাড়টা।'

গুলির শব্দ শুনে আমার ঘোড়াটাও ক্ষেপে গেলো হঠাৎ। জিন থেকে ছিটকে পড়তে গিয়েও রক্ষা পেলাম অল্পের জন্য। অনেক কষ্টে বাগে আনলাম সেটাকে।

চলতে চলতে জিনের ওপর ঘুরে পেছনে তাকাল বেলি। 'রিংকনটা ওখানে।' আঙুল দিয়ে সামনে দেখালো ও।

রিংকনটা কোথায় তা জানি আমি। অ্যারিয়েল ফটোগ্রাফারের সাহায্যে পুরা দেশটা সম্পর্কে একটা ধারণা আছে আমার। রিংকনের পেছন দিয়ে আরও একটা ট্রেইল গেছে পশ্চিমে। ওটাও একটা এসকেপ রুট হতে পারে আমার।

সামনের পয়েন্টটা ব্ল্যাক জ্যাক পয়েন্ট। তার পাশ দিয়েই রিংকনে গিয়ে মিশেছে ট্রেইলটা। রিংকনের পর লস্ট রিভার। জন টুমির ডায়রিতে উল্লেখিত শেষ জায়গার নাম।

হঠাৎ কয়েকটা ভীত সন্ত্রস্ত হরিণ দৌড়ে গেলো সামনে দিয়ে। বুঝতে পারলাম, রিংকন আর দূরে নয়। রিংকনের পানি, ছায়া আর নরম ঘাসের লোভে পাহাড়ী হরিণ এসে জড়ো হয় ওখানে। দৌড়ে পালাচ্ছে মানুষের সাড়া পেয়ে।

ঢালু ট্রেইল ধরে রিংকনে নামছি আমরা। ট্রেইলটা চওড়া এখানে। একটু আগের গুলির শব্দ দুটো মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে আমার। পালাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠলো আবার। পেছনে তাকিয়ে জিম্বো আর আমার দূরত্বটা হিসেব করে নিলাম মনে মনে। তারপর প্রাণপণে

টেনে ধরলাম ঘোড়ার রাশটা। হঠাৎ রাশে টান পড়ায় পেছনের দু'পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াটা। চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছাড়লো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। আর ঠিক তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ট্রেইলের পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলোর ওপর। পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সরে গেলাম মাথা সমান উঁচু অন্য একটা ঝোপের দিকে।

চিৎকার শুনলাম জিম্বোর। 'ধরো ওকে! কলিন, ধরো ওকে!'

যেখানটায় ডাইভ দিয়েছি আমি, ঘোড়া ঘুরিয়ে সেখানে এসে দাঁড়ালো কলিন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ঝোপঝাড়গুলোর দিক। আমি তখন ট্রেইল থেকে ষাট ফুট দূরে। কয়েকটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ক্রল করে এগিয়ে যাচ্ছি শুকনো একটা খাদের দিকে। একসময় পানি গড়াতো এখানে। খাড়া ঢালের দিকে চলে গেছে খাদটা।

খানিকটা গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম ট্রেইলের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে জিম্বো। রাইফেলটা হাতে। কলিন আর ডোরি দুজনই ঘোড়ার উপর বসা। অস্থির ভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

বেলি একটু দূরে। জিম্বোর দিকে তাকিয়ে আছে ও। মতলবটা বুঝতে বাকি রইলো না আমার। রেসি নেই সাথে। জিম্বো অন্যমনস্ক। কলিন আর ডোরি নিরস্ত্র। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছে বেলি। হঠাৎ ঘোড়াটা ঘুরে গেল ওর। ছুটতে গিয়েও থেমে গেলো সাথে সাথে। কারণটা দেখলাম আমি।

র‍্যাঞ্চে প্রথম দেখা সেই ঘোড়সওয়ার দু'জন। রিপ পার্কার আর ড্যাড স্টাইল। বেলির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে ওরা।

আটকে গেছি ওদের জালে। খুন হতে যাচ্ছি একটু পর। তীর চিহ্নিত ট্রেইলটা দেখতে গেছে রেসি। এটা দল ত্যাগ করার ওর একটা অজুহাত মাত্র। আসলে সবার অলক্ষ্যে আমাকে খুন করতে চাইছে ও। তারপর খুনের দোষটা চাপাবে পিয়োর ঘাড়ে।

পাঁচ

ট্রেইল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে, একটা ক্যাকটাস ঝোপের আড়ালে শুয়ে হিসেব করে দেখছি পালাবার সম্ভাবনাগুলো। হাজার ভাগের একভাগ সম্ভাবনাও দেখছি না বাঁচার। কিন্তু কে চায় ইচ্ছা করে ধরা দিতে? তীব্র হয়ে উঠলো বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাটা। শুধু বেঁচে থাকাই নয়। জয়ী হতে হবে এ লড়াইয়ে।

পেছনের ঢালটার দিকে তাকালাম। অসংখ্য সিডার আর কাঁটা-জাতীয় গাছে ঢাকা। বাঁ পাশে একটা টিলা। প্রায় সাতশো ফুটের মতো উঁচু। মনে মনে ভাবলাম, ওটাই আমার পালাবার একমাত্র পথ।

রেসি থাকতে পারে ওপরে। কিন্তু ট্রেইলেও আছে চারজন পুরুষ। সবাই জিনের ওপর বসা। সুতরাং পালাবার জন্য এমন একটা পথ বেছে নিতে হবে, যেখানে ঘোড়ায় চড়ে ধাওয়া করতে পারবে না কেউ। নিরস্ত্র হলেও বনে জঙ্গলে চলাফেরা করার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আমার, ওদের ততটুকু আছে কিনা সন্দেহ আছে।

কয়েক ফুট পেছনে সরতেই গর্ত পেলাম একটা। ট্রেঞ্চের মতো লম্বা। মাটি পড়ে আর আগাছা জন্মে ভরে গেছে প্রায়। হামাগুড়ি

দিয়ে নেমে পড়লাম গর্তটার ভেতর। ক্রল করে দ্রুত এগোলাম টিলাটার দিকে। একটা সিডার গাছের কাছে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে গর্তটা। ভরাট হয়ে গেছে মাটিতে। উঠে দাঁড়ালাম গাছটাকে আড়াল করে ওখান থেকে এক লাফে বড় একটা পাথরের আড়ালে।

পায়ের শব্দটা শুনতে পেলো কলিন। কিন্তু অস্পষ্ট হওয়াতে কোন্‌দিক থেকে এলো ধরতে পারলো না। আন্দাজের ওপর ভর করে বললো, 'ফিরে এসো, রাইটার। পিয়ো তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

পাথরটার আড়ালে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম টিলাটা। পাদদেশ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে গেছে এবড়ো থেবড়োভাবে। একবার পৌঁছতে পারলে অসুবিধা হবে না উঠতে।

'যা করার জলদি করো, কলিন,' উত্তেজিত গলা শোনা গেলো ডোরির। 'এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলতে থাকলে পালিয়ে যাবে ও।'

লক্ষ্য করলাম, খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরই টিলার গা। টিলায় উঠতে হলে পেরোতেই হবে এটুকু। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে পার্কার ও স্টাইল।

মাথা নিচু করে দৌড় দিলাম ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে। কিন্তু পাঁচ কদমও যেতে পারি নি। ঠকঠক করে বাড়ি খেলো দু'হাঁটু। নার্ভ হারিয়ে ফেললাম ভয়ে। পড়ে গেলাম ধপাস করে।

'কি যেন নড়তে দেখলাম ওখানটায়—ঢালটার পাশে,' চিৎকার করে উঠলো ডোরি।

আমার পরনে গ্রেট রঙের স্ল্যাকস আর জলপাই রঙের শার্ট। বনে জঙ্গলে এই পোশাকে দূর থেকে বন্যজন্তু বলে ভুল করবে অনেকে। একমাত্র নড়াচড়াটাই ভেঙে দেবে ভুলটা। পড়ে রইলাম চুপচাপ।

'পাখিটাখি হবে হয়তো,' বললো জিম্বো। 'খরগোসও হতে পারে।'

'কাছে গিয়ে দেখে এসো জিম্বো।' ওদের কথা শুনে বললো কলিন। 'রেশি দূরে যেতে পারে নি এখনও।'

ছ্যাঁত করে উঠলো বুকের ভেতর কিন্তু চুপচাপ পড়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই এখন। একটু সন্দেহ হলেই গুলি করবে জিম্বো।

'দরকার নেই,' কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বললো ও। 'ভুল দেখেছে ডোরি। বাতাসে গাছের পাতা নড়তে দেখেছে।'

আমি সশস্ত্র কিনা জানা নেই জিম্বোর। তাই দেখতে এসে জীবনটা খোয়াতে চাইছে না সে।

হঠাৎ শুকনো পাতা মাড়াবার শব্দ হলো কাছাকাছি। কেঁপে উঠলো শরীরটা। এক ঝলক রক্ত ছলকে উঠলো বুকের ভেতর। সাবধানে মাথাটা একটু কাত করে তাকালাম শব্দের উৎসের দিকে। লম্বা লম্বা ঘাসে বাধা পাচ্ছে দৃষ্টি। ফাঁক দিয়ে দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পার্কার আর স্টাইল।

ঘোড়ায় বসে আছে বেলি। কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না ওকে নিয়ে। সবার মনোযোগ এখন আমার দিকে। যদি একটা মুহূর্তের জন্য ওদেরকে অন্যমনস্ক করতে পারে বেলি, একটা ডায়ভারশন তৈরি করতে পারে, এ সময়টুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। সরে যেতে পারবো নিরাপদ জায়গায়।

বেলিও তাই ভাবছে। আচমকা ঘোড়া ছোটালো ও সামনের দিকে। ঝর্ণা বরাবর।

পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলাম সুযোগটা। উঠে দাঁড়ালাম বিদ্যুৎ বেগে। এক ছুটে পেরিয়ে গেলাম ফাঁকা জায়গাটা। টিউমারের মতো বেরিয়ে থাকা পাথর বেয়ে দ্রুত উঠে গেলাম কয়েক ফুট। শোরগোল

শোনা গেলো নিচে। কিন্তু আমাকে দেখে, নাকি বেলির পালিয়ে যাওয়ায়, বোঝা গেলো না।

প্রায় একশো ফুট উঠে থামলাম দম নেয়ার জন্য। তাকালাম ওপরের দিকে। লক্ষ্য করলাম, একটা অপ্রশস্ত কার্নিশের মতো দেখা যাচ্ছে আরও দেড়শো ফুট উঁচুতে। টিলাটার পাঁজর ঘেঁষে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে কার্নিশটা।

আবার শুরু করলাম উঠতে। শরীরের প্রতিটা পেশী এখন সজাগ। পাথরের টিউমারগুলোর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না একটা থেকে আরেকটার। হাতের আঙ্গুলের ওপর চাপ বাড়ছে অনবরত। মরিয়া হয়ে টিলার সাথে চেপে রেখেছি বুক, পেট, উরু। ছোট্ট গর্তে হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে বাঁ পা দিয়ে অনুভব করছি খাঁজ। চাপ মেরে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছি আলগা পাথর কিনা। দেহের ভার সইতে পারবে মনে হলেই পা রাখছি সেখানে। তারপর একই ভাবে তুলে আনছি ডান পা। সড় সড় করে ঘাম নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করছি।

কার্নিশটার কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা ঝুল পাথরের ওপর থামলাম। তাকালাম নিচের দিকে। পিস্তল হাতে পায়চারি করছে জিম্বো। আর কেউ নেই কোথাও। অনেক দূরে একটা ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে শুধু। বেলি পালিয়েছে সেদিকে।

এই অঞ্চলটা কত কু চেনে মেয়েটা, জানি না। কিন্তু একটা কথা ভালোভাবে জানি, জীবনের অনেকগুলো বছর কগার র‍্যাঞ্চে কেটেছে বেলির। অনেকবার এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেছে ও। লুকোবার জায়গা কোথায় থাকতে পারে অজানা নয় ওর। সম্ভবত তাই করবে বেলি।

অসাড় আঙুলগুলো টেনেটুনে সোজা করে উঠতে শুরু করলাম আবার। আগের চেয়েও খাড়াভাবে উঠতে হচ্ছে এখন। কিন্তু প্রত্যেকবারই হাত পা রাখার ফাঁক ফোকর পেয়ে যাচ্ছি। অসুবিধা হচ্ছে না উঠতে।

আর মাত্র ফুট পাঁচেক বাকি কার্নিশে ওঠার। হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ হলো মাথার ওপর। পাথরে বুট ঘষার শব্দ।

খুব খারাপ একটা জায়গায় ধরা পড়ে গেলাম। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য উঠে এলাম কার্নিশে।

আশ্চর্য একটা বাঁক নিয়েছে এক ফুট প্রশস্ত কার্নিশটা। ক্রমশ ঢিকন হয়ে মিশেছে গিয়ে মেসার সাথে।

মেসার ঠোঁট ঘেঁষে বড় একটা পাথরের ওপর বসে আছে ফ্লয়েড রেসি। হ্যাটটা পেছন দিকে ঠেলে দেয়া। ঠোঁটে রহস্যের হাসি।

ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'ভালো, শেষ পর্যন্ত তোমার হাতেই ধরা পড়লাম।'

'শুধু ধরা না, রাইটার। মারাও যাবে আমার হাতে।' রাইফেলটা দুহাতে কোমর পর্যন্ত তুলে ধরে উঠে দাঁড়ালো রেসি।

'তার আগে একটা কথার জবাব দাও, রেসি। স্টেকড প্লেইন পেরোনার পর যে লোকটার সাথে টমিদের দেখা হয়েছিলো, কে সে? তোমার পিতামহ?'

চমকে উঠলো রেসি। 'কোথায় শুনেছো এসব কথা?'

ব্লাফ ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই আমার। অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবে বললাম, 'জন টমির একটা অসমাপ্ত ডায়রি পাওয়া গিয়েছিলো। অনেকেই জানে তা।'

'তাহা মিথ্যা কথা। গুজব।'

'আমার মতো গবেষণা করলে তুমিও জানতে পারতে। কানসাস ঐতিহাসিক পাক্ষিকে দুটো আর্টিকেল লেখা হয়েছিলো এ নিয়ে।'

'ওসব কাহিনী আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, রাইটার।'

'একটা কথা মনে রেখো রেসি, আমাকে খুন করার পরিণাম খুব ভালো হবে না। আরিজোনায় আসার পর যেটুকু জানতে পেরেছি, টেপ করে সব পাঠিয়ে দিয়েছি লস অ্যাঞ্জেলেস। আমার কিছু হলে খুনের দায়ে ফেঁসে যাবে তোমরা।'

'কিন্তু আফসোস হচ্ছে রাইটার। তুমি তা দেখে যেতে পারবে না।' ডান হাতটা উইনচেস্টারের বাটে। তর্জনীটা চলে গেলো ট্রিগারে।

হঠাৎ একটা পাথর খসে পড়লো কোথাও। হয়তো অনেক কালের ক্ষয়ের সাথে লড়তে লড়তে টিকে থাকতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

চমকে উঠে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলো রেসি।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিদ্যুৎ বেগে। বাঁ হাতে ব্যারেলটা চেপে ধরে ডান হাতে দমাদম কয়েকটা ঘুসি মারলাম তলপেটে।

কান ফাটানো শব্দ হলো গুলির। নীলচে ধোঁয়া দেখা গেলো রেসির উইনচেস্টারের নলে। ধস্তাধস্তিতে আচমকা বেরিয়ে গেছে গুলিটা।

আবার গুলি করতে হলে কক্ করতে হবে রাইফেল। এ সময়টুকুই যথেষ্ট। চট করে ব্যারেলটা ছেড়ে দিয়ে জুডোর প্যাঁচ কষলাম। আর্মিতে থাকার সময় ভালোভাবেই রপ্ত করে ছিলাম এ বিদ্যাটা।

আছড়ে পড়লো রেসি। কিন্তু পড়েই তেরছা ভাবে রাইফেলের বাট চালালো আমার মাথা লক্ষ্য করে।

ঝট করে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিয়েও পুরোপুরি রক্ষা পেলাম না। কানের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে গেলো বাড়িটা। বোঁ করে ঘুরে

উঠলো মাথাটা। টিলাটা টলমল করে উঠলো চোখের সামনে। কিন্তু রাইফেল কক্ করার শব্দে টনটনে জ্ঞান ফিরে এলো আবার। মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে সাফ করেই প্রচণ্ড জোরে লাথি মারলাম রেসির কব্জিতে। ছিটকে গেলো রাইফেলটা হাত থেকে। পাথরে পাথরে খটাখট বাড়ি খেয়ে নেমে গেলো ঢাল বেয়ে। তারপর আটকে গেলো কোন কিছুর সাথে।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইলো রেসি। সাথে সাথে ডান পা-টা ধরে একটা মোচড় দিতেই মুখ থুবড়ে পড়লো আবার। বুকটা আছাড় খেলো শক্ত পাথরের সাথে। দমাদম করে কয়েকটা লাথি চালালাম পাঁজরে। ঘোঁত করে একটা শব্দ বেরোলো রেসির মুখ দিয়ে। পরক্ষণেই জ্ঞান হারালো।

রাইফেলটা দরকার আমার। কোথায় আটকালো ওটা, দেখার জন্য যেই পা বাড়িয়েছি ঢালের দিকে অমনি একটা গুলি হলো নিচে। আমার কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে গেলো গুলিটা। পেছনের পাথরে বাড়ি খেয়ে গর্জে উঠলো আরেকবার।

ঝুপ করে বসে পড়লাম একটা পাথরের আড়ালে। উঁকি দিলাম নিচে। রাইফেল হাতে মেসার ওপর টার্গেট খুজছে জিম্বো।

ছেড়ে দিলাম রাইফেলের আশা। মেসা থেকে নামার পথ খুঁজতে শুরু করলাম। রেসি যেই পথে উঠেছে এখানে। পেয়ে গেলাম অবশেষে। পুরোনো এবং অব্যবহৃত ট্রেইল। অনেক আগে ইণ্ডিয়ানরা চলাচল করত এপথে। সব জানে পিয়ো। এই ট্রেইলের সাথেই মিশেছে ওর তীর চিহ্নিত হেঁইলটা। মেসা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পুবে নিউ রিভার পর্যন্ত গেছে ওটা।

ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করলাম টিলাটা অপর পাশে। পেছনে ফিরে

তাকালাম একবার। জ্ঞান ফিরে এসেছে রেসির। উঠে দাঁড়াবার কসরত করছে সে।

নিচে নেমে দু'মিনিট ব্যয় করলাম রেসির ঘোড়াটা খুঁজতে। না পেয়ে দৌড়ুতে শুরু করলাম দক্ষিণ পুবে।

মাইল খানেক যাবার পর অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলাম পেছনে। ছুটতে ছুটতে ঘুরে তাকালাম। যা ভেবেছি তাই। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে জিম্বো ওয়েলস। সূর্যের আলো পড়ে ঝিলিক মেরে উঠলো ওর হাতের রাইফেলটা।

হাতুড়ির ঘা পড়লো হৃৎপিণ্ড বরাবর। দ্রুত বাঁ দিকে সরে গেলাম ট্রেইল থেকে। হাঁটু সমান উঁচু কাঁটাগাছ আর পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে ছুটছি এখন। পেছনে তাকাচ্ছি বারবার। অনেকটা কাছে এসে গেছে জিম্বো। আমার ছোটার গতি বেড়ে যাচ্ছে আরও।

দেখতে পাই নি গর্তটা। হুড়মুড় করে পড়লাম গিয়ে সেটার মধ্যে। শুয়ে শুয়েই তাকালাম চারপাশে। গর্ত নয়। পানি প্রবাহের শুকনো খাদ। উরু সমান হবে নিচু। পাহাড়ের পানি গড়ায় বৃষ্টির সময়। কিছু দূর গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেছে খাদটা।

উঠে ছুটতে শুরু করলাম আবার। বাঁকটা ঘুরেই হঠাৎ শেষ হয়েছে খাদটা। তারপরই শুরু হয়েছে মসৃণ ঢাল। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে কাচের মতো চকচক করছে ঢালটা। খাড়াভাবে নেমে গেছে পঞ্চাশ ফুট। তারপরই একটা গর্তের মত জায়গা।

পাথরের ওপর ক্ষুরের শব্দটা শুনতে পেলাম আবার। মরিয়া হয়ে উঠলাম বাঁচার জন্য।

খাড়া ঢালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁকি দিলাম নিচে। লাফ দিয়ে নামা সম্ভব নয়। সুচালো পাথর দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। একটু

উনিশ বিশ হলে গেঁথে যাবে। মসৃণ দেয়ালটার দিকে নজর দিলাম এবার। আঙ্গুল ঢোকাবার মতো কয়েকটা গর্ত ছাড়া আর কিছুই নেই।

দ্রুত জুতাজোড়া খুলে ফেলে দিলাম নিচে। ঝুলে পড়লাম ঢালের প্রান্তটা ধরে। ভয়ঙ্কর বিপদ জনক ঝুঁকি। কিন্তু জিম্বোর হাতের রাই-ফেল ঝুঁকিটা নিতে বাধ্য করেছে আমাকে। হয়তো পথ একটা পেয়ে যাবো নিচে নেমে।

ঝুলে পড়ায় শরীরের সমস্ত ভার এসে পড়লো হাতের আঙ্গুলগুলোর ওপর। ডানে বাঁয়ে পা বাড়িয়ে পাগলের মতো খুঁজছি সেই গর্তগুলো। পনের সেকেণ্ড পর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ঠেকলো একটা। আরও দশ সেকেণ্ড পর বাঁ পায়েরটা। শরীরের কিছুটা ভার চাপালাম পায়ের ওপর। এবার ডান হাতটা কানিশ থেকে তুলে এনে আঙ্গুল চালালাম পাথরের গায়ে। বুকের কাছে পেলাম গর্তটা। আকারটা ছোট। জোর করে ঢোকালাম তর্জনী আর মধ্যমাটা। তারপর নামিয়ে আনলাম বাঁ হাত। গলা থেকে দশ ইঞ্চি বাঁয়ে বড়সড় একটা গর্তে ঢুকলো সেটা।

ধীরে ধীরে ডান পা টা তুললাম গর্ত থেকে। বসিয়ে দিলাম নিচে, যতদূর পর্যন্ত যায়। কয়েক সেকেণ্ড পর অনুভব করলাম গর্তটা। তারপর নামিয়ে আনলাম বাঁ পা-টা।

ঠিক দশ মিনিট পর। অসাড়, অনুভূতিহীন মনে হচ্ছে হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো। আর সইতে পারছে না শরীরের ভার।

হঠাৎ ডান হাতের আঙ্গুলটা পিছলে গেলো গর্ত থেকে। কাত হয়ে গেলো শরীরটা। শরীরের সমস্ত ভার গিয়ে পড়লো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর। পাগলের মতো হাত চালালাম ঢালটার গায়ে।

অবাক হলাম পড়ে যাই নি দেখে। অনুভব করলাম, ছুটে যাওয়া গর্তটা খুঁজে পেয়েছি আবার।

টিকটিকির মতো চার হাত পায়ে লটকে দম নিলাম এক মিনিট। তারপর আবার শুরু করলাম নামতে। সাত আট ফুট ওপরে থাকতেই ছেড়ে দিলাম হাত পা।

জুতা জোড়ায় পা গলিয়ে তাকালাম চার পাশে। বড় জোর কুড়ি ফুট লম্বা আর পনেরো ফুট প্রস্থ হবে গর্তটা। একপাশে চৌবাচ্চার মতো বেসিন। সামান্য পানি আছে তলায়। একটা ঝুল পাথর প্রায় ঢেকে রেখেছে বেসিনটা।

একটাই মাত্র পথ নিচে নামার, একটু আগে যে পথে নেমেছি আমি। উঠতে হলেও তাই। কিন্তু এখন আর ওটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পালাতে হবে অন্য পথে।

গর্ত থেকে পানি গড়াবার পরের ঢালটার প্রান্তে গেলাম দৌড়ে। নিচে উঁকি মেরেই পিছিয়ে এলাম সভয়ে। আত্মহত্যা ছাড়া ওপথে নামার চেষ্টা করে না কেউ। খাড়া ঢাল। পাথরের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে জানার উপায় নেই।

অস্তিত্বটা অনুভব করলাম নিজের। বুঝতে পারছি, আটকে গেছি ফাঁদে। এর চেয়ে ভালো ফাঁদ আর কি হতে পারে! সম্ভবত ওরাও তা জানে।

পানি খেয়ে ঝুল পাথরটার আড়ালে গিয়ে বসলাম। ক্লান্তি আর অবসাদে বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদটা জাগিয়ে রাখছে আমাকে।

হঠাৎ একটা নড়াচড়ার শব্দ হলো ওপরে। কিছু কুচি পাথর ছিটকে পড়লো নিচে। আরও সেঁটে গেলাম পাথরটার সাথে।

'শেরিডান?' কলিনের গলা। 'আমরা জানি তুমি নিচে আছো।'

বুঝতে পারছি, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে কলিন। আমাকে নামতে

দেখে নি কেউ। সন্দেহ করছে।

কিছুক্ষণ পর পাথরের সাথে ধাতব সংঘর্ষ হলো কোনকিছুর। বেশ কয়েকবার হলো। কেঁপে উঠলো অস্তিত্ব। কি করছে ওরা? নামার জন্য তাক বানাচ্ছে ঢালটার গায়ে? কিন্তু যতটুকু জেনেছি, আমার মতো পারদর্শী নয় ওরা। ওপর থেকে সাহায্য না করলে এই ঢাল বেয়ে নামা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। এমন বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবে না কেউ। তাহলে? হঠাৎ ভাঙলো ভুলটা। কিছুটা দেরিতে হলেও উপলব্ধি করলাম, গর্ত গুলো ভেঙে ঢালের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে ওরা। ওপর থেকে মাত্র দু'চারটা গর্ত মিশিয়ে দিতে পারলেই ওঠার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে আমার। ধুকে ধুকে মরতে হবে খাবারের অভাবে! কোন জখম থাকবে না শরীরে, থাকবে না আঘাতের চিহ্ন। বুলেটের চেয়ে এটাই হবে অধিকতর সুন্দর পন্থা। ব্যাখ্যা দিতে সহজ হবে কলিনের।

'তোমাকে নিয়ে আর মাথা ব্যথা নেই আমাদের,' কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার বললো কলিন 'আমাদের জন্য ক্ষতিকর, এমন কোনো টিপ যদি সত্যিই থাকে, খুঁজে বের করবে আমার লোকেরা।'

সেক্রেটারির কথা ভেবে খারাপ হয়ে গেলো মনটা। কিছুই জানে না বেচারী। হাজার টর্চার করলেও একটা কথা বেরোবে না মুখ দিয়ে।

আর দেরি করা চলে না আমার। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক, বেরোতে হবে আমাকে।

অনেকগুলো ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলাম একসাথে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দগুলো। চলে গেলো ওরা।

হঠাৎ কবরের স্তব্ধতা নেমে এলো চারপাশে।

ছয়

গনগনে সূর্যটা এখন ঠিক চাঁদির ওপর। কিন্তু আটকে পড়া এই কারাগারের ভেতর আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। ওপরে ফিতার মতো এক চিলতে নীল আকাশ। সামনে ফাটলের মতো সরু একটা গিরিপথ। এত সরু যে কাঁধ সোজা রেখে এগোনো যাবে না। সামনে একটা বাঁক নিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেই আড়াল করে দিয়েছে গিরিপথের দেয়ালটা। যে পৃথিবীটা আমার অত্যন্ত পরিচিত। একান্ত আপন।

যেন অনন্ত কাল ধরে বসে আছি আমি। যারা জনশূন্য অবারিত পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটায়, প্রকৃতিকে বোঝার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা জন্মায় তাদের। একাকিত্ব তাদের অস্থির করে না। কথা বলার সুযোগ থাকে না বলেই তাদের শ্রবণ শক্তি হয় প্রখর। বুঝতে শেখে শব্দের ভাষা। অনায়াসে ধরতে পারে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক শব্দের পার্থক্য।

নির্জনতা কখনও নীরব নিথর হয় না। অস্পষ্ট একটা মর্মর ধ্বনি সব সময়ই ভেসে বেড়ায় বাতাসে। শুনতে শেখাটাও একটা আর্ট। যা অর্জন করতে হয়। মরু বা বনের গান শোনার মতো কান একজন সুরকারের কানের চেয়েও তীক্ষ্ণতর হয়।

আমি জানি, এ মুহূর্তে গোটা জীবনটাই একটা সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছে। এটা কোনো গল্প উপন্যাস লেখা নয়। রূঢ় কঠিন বাস্তব। সামনে অপেক্ষা করছে লড়াই। বাঁচার লড়াই। শুধু নিজের জন্য নয়, বেলির জন্যও। যদি আমরা মরে যাই, একটা সত্যেরও কবর হয়ে যাবে সেই সাথে। যে সত্য কেউ আর কোনোদিনও জানতে পারবে না।

মস্তিষ্ক! মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র! এ মুহূর্তে এই অস্ত্রটাই আমার একমাত্র সম্বল।

বসে রইলাম চুপচাপ। নিজ নতার অস্পষ্ট সুর গুনগুনিয়ে যাচ্ছে কানে। পাহাড়ী রুক্ষতা আর আদিমতার সাথে একাকার এখন আমি। কেউ হয়তো বর্বর ভাববে। কিন্তু বর্বরদেরই জায়গা এটা। এখানে টিকে থাকতে হলে বর্বরই হতে হবে।

অ্যালভারেজদের কথা মনে হলো আবার। ওরা আংশিক অ্যাপাচি। টুমিরা যখন গরুর পালটা নিয়ে এসেছিল ভার্ডের উপত্যকায়, ওদের চোখ এড়িয়ে কোনোকিছুই হবার জো ছিলো না।

উঠে আবার হাঁ-মুখো খাদটার কানায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে তাকাতেই গলাটা শুকিয়ে গেলো। একটা গিরগিটির পক্ষেও ঐ খাড়া দেয়াল বেয়ে নামা সম্ভব নয়।

হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা পাথরের তলায় জমে থাকা কিছু বালি নজরে পড়লো। বুনো জীবজন্তুর পায়ের ছোঁয়া পড়ে না, এমন জায়গা খুব কমই থাকে পাহাড়ে। কখনও কখনও ওদের পদচিহ্নই পৌঁছে দেয় কোনো জলাশয়ে। ভাগ্য ভালো হলে পালাবার পথও মিলে যায়।

কিন্তু কপাল খারাপ আমার। তেমন কোনো ট্র্যাকই চোখে পড়লো

না। এ যেন এক অদ্ভুত জায়গা।

বৃষ্টির পানিতে ভেসে আসা শুকনো কাঠ পাওয়া গেলো। যাক, রাতে অন্তত আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাটা হলো। এই পাহাড়ী অঞ্চল সম্পর্কে ভালোই জানা আছে আমার। সমুদ্র পিঠ থেকে হাজার ফুট উঁচু। তপ্ত গ্রীষ্মেও তেমন গরম হয় না। সূর্য ডোবার সাথে সাথে ঝপ করে নেমে আসে ঠাণ্ডা।

এর মধ্যে গোলাগুলির আর শব্দ আসে নি কানে। বেলির চিন্তা-টাও হটিয়ে রেখেছিলাম এতক্ষণ। প্রথম সুযোগেই ওদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে মেয়েটা। নিজের চেহারার মতোই এই এলাকাটা চেনে ও। লুকোবার মতো ঘাই-ঘুপচির কথা অবশ্যই জানা আছে ওর। আরও সাত-পাঁচ বোঝালাম নিজেকে। তবুও দুশ্চিন্তার ঘোরটা কাটলো না।

জোর করেই ঝেড়ে ফেললাম চিন্তাটা। অন্যকিছু ভাবতে চেষ্টা করলাম। ফ্লয়েড রেসি আর চুপ করে থাকবে না এরপর। এই মরণ ফাঁদে আমার আটকে পড়ার কথা জানার পরও নিশ্চিন্তে থাকবে না সে। বে-ধড়ক মার খেয়েছে আমার হাতে। কিছুতেই ভুলবে না। নিজের চোখে দেখবে আমার দুর্দশা। উপভোগ করবে।

ছায়া গাঢ় হয়ে এলো ক্রমে। খুব সাবধানে আগুন জ্বালালাম পাথরের আড়ালে। মনের ভেতর কেবল একটা কথাই পাক খেয়ে উঠছে বারবার। বেরোতেই হবে। যে ভাবে হোক মুক্ত হতে হবে এই দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম। তিন লাফে পৌঁছে গেলাম গিরিপথটার কাছে। গিরিপথের দেয়াল দুটোকে যে ওপরে ওঠার কাজে একসাথে ব্যবহার করা যায়, কথাটা একবারও মনে হয় নি আগে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

পরীক্ষা করতে শুরু করলাম।

কিন্তু আবার সেই নিরাশা। মসৃণ দেয়াল থেকে পিছলে পড়লো দৃষ্টি। হাত পায়ের আঙ্গুল রাখার মতো একটা খাঁজ বা গর্ত নেই কোথাও। একটা চিড় পর্যন্ত নেই। কিন্তু এমনটা হতে পারে না কিছুতেই। পথ একটা নিশ্চয়ই আছে। যদি না-ই থাকে, নিজেই তৈরি করে নেবো। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমি।

আঁধার না নামা পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়। পথটা কি ভাবে তৈরি করা যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একাগ্রতা নিয়ে তাই ভাবলাম।

বেরোতে না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই। খোঁজ করতে একসময় না একসময় সার্চ পার্টি আসবেই। কিন্তু তার আগেই রেসিওর কাজটা সেরে নেবে। জানে মারবে না। স্রেফ পছন্দ মতো জায়গায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে। আর আজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

ফিরে গিয়ে আগুনটাকে আরেকটু উসকে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বন্ধু বান্ধবের কথা ভাবলাম। আমার নিখোঁজ হবার খবর পেলেই ছুটে আসবে সবাই। আটকাতে পারবে না কলিন। হেলিকপ্টারে করে আঁতিপাতি করে খুঁজবে। কয়েকজন পাকা পর্বতারোহীও আছে ওদের মধ্যে। কোথায় কিভাবে খুঁজতে হয় জানে ওরা।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। জেগে উঠলাম ভোরের কনকনে শীতে। ফরসা হয় নি এখনও। একটা উজ্জ্বল তারা তখনও ঝুলে আছে আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওটাও হারিয়ে যাবে খাড়া দেয়ালটার আড়ালে। ঐ দেয়ালটাই বাইতে হবে আমাকে।

কাজটা আত্মহত্যারই সামিল। ওরকম মসৃণ দেয়ালে দড়ি বেয়ে

ওঠাই দুষ্কর। একা খোলা হাত পায়ে চেষ্টা করাটা নেহাতই পাগলামী। বলার অপেক্ষা রাখে না কথাটা। ভাগ্যক্রমে যদি সম্ভবও হয়, থাকছে রেসি। ওপরে উঠেই হয়তো দেখবো, বসে আছে। হাতে উদ্ধত রাইফেল। ব্যাপারটা দারুণ এনজয় করবে ও।

আগুনে আরও কয়েকটা শুকনো ডাল ফেলে বসে রইলাম। ঘটনাটার সাথে জড়িয়ে পড়ায় গাল দিলাম নিজেকে।

দিনের প্রথম রোদ আবির ঢাললো উঁচু চূড়াটায়। পেট ভরে পানি খেয়ে উঠে পড়লাম। নিভিয়ে দিলাম আগুনটা।

সুতোর মতো কিছু আঁচড় চোখে পড়লো খাদের ওপরের দেয়ালে। ডান দিকটায় টিউমারের মতো ফুলে ওঠা জায়গাও আছে একটা। তার নিচেই অস্বাভাবিক চেহারার একটা গর্ত। আঙুলের প্রথম ভাঁজটা ঢোকাবার মতো কিছু খাঁজও পাওয়া যেতে পারে হয়তো। একচুল এদিক সেদিক হলেই মুক্তি। যে মুক্তির কোনো আস্বাদ নেই। ভাবতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেলো শিরশির করে।

বাঁয়ে তাকালাম। ওদিকেও মসৃণ খাড়া পাঁচিল। তবে দু'ফুট দূরে একটা সিডার গাছ মাথা বের করে আছে। পাঁচিলটার কোনো গর্ত থেকেই বেরিয়েছি বোধ হয়। মাথাটা ছাতার মতো দেখতে। ঘিঞ্জি ডালপালায় ঠাসা। চেষ্টা করেও গোড়াটা দেখা গেলো না। দেখলে মনে হয় শূন্যে ঝুলে আছে। তেমন বড় নয় গাছটা। তবে ডালপালাগুলো শক্তই হবে মনে হয়। অন্তত তাই আশা করছি আমি। কয়েক ফুট ওপরে সরু একটা কার্নিশ। চওড়ায় দুই ইঞ্চির বেশি হবে না কিছুতেই। লম্বায় ফুট ছয়েকের মতো।

মাথাটায় দাঁড়ালে নাগালে পাওয়া যাবে কি কার্নিশটা? হয়তো যাবে···। তারপর?

কোটটা খুলে পায়ের কাছে রাখলাম। কেউ খোঁজ করতে এলে সহজেই দেখতে পাবে। স্থির দৃষ্টি রাখলাম গাছটার মাথায়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে বল্লমের ফলার মতো বেরিয়ে আছে শুকনো ডাল। মাঝের ছ'ফুট ফাঁকটার মাপ-জোখ হিসেব করে নিলাম মনে মনে। নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে এলো আপনিই।

লাফ দিয়ে ভেসে পড়লাম শূন্যে। কি হবে না হবে তা নিয়ে আর ভাবছি না এখন।

ভুল হয় নি হিসেবে। হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে গিয়ে পড়লাম মাথাটার ওপরে। বুকের তলায় মড়মড় শব্দ হলো শুকনো ডাল ভাঙার। দুলে উঠলো গাছটা। কিন্তু ঘন সতেজ ডালগুলো ধরে রাখলো দেহটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম ডালপালার ওপর। খাড়া দেয়ালটা ধরে ভারসাম্য রাখলাম শরীরের।

একটু ওপরেই সরু কার্নিশটা। কিন্তু নাগালের বাইরে। দিলাম লাফ। দু'হাতের তালু আছড়ে পড়লো মসৃণ দেয়ালে। কিন্তু কার্নিশটা হাতে ঠেকছে না কেন? নেমে যাচ্ছে শরীর। পিছলে নামছে হাত। মিস করেছি কার্নিশটা।

হঠাৎ আটকে গেলো হাত দুটো। আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতো গেঁথে বসেছে কার্নিশে। পেণ্ডুলামের মতো ঝুলে রইলো দেহটা। একটু দম নিয়ে সরে যেতে লাগলাম কার্নিশ ধরে।

কার্নিশের একটু নিচেই দেখলাম ফাটলটা। বাঁ পাশে। বাঁ পা টা উঠে গেলো ওখানে।

পায়ের ওপর ভার চাপিয়ে ডান হাতটা ভাঁজ করে তুলে আনলাম কার্নিশে। তারপর শেষ শক্তিটুকু দিয়ে টেনে তুললাম শরীরটা।

উপুড় হয়ে রইলাম ওখানেই। নিচে রাক্ষুসে খাদ, পাশে মসৃণ

দেয়াল। কার্নিশের শেষ প্রান্তের দিকে তাকালাম। টিউমারের মতো ফুলে থাকা সেই জায়গাটায় আটকে গেলো দৃষ্টি। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়েছে ওটা। ঝুলে আছে কার্নিশটার দু'ফুট উঁচুতে। সুড়ঙ্গের মতো মনে হচ্ছে নিচের ফাঁকটু। বুকে হাঁটা ছাড়া যাবার উপায় নেই।

ঠিক তখনই, শক্ত পাথরে বুট ঘষার শব্দটা এলো কানে। টান-টান হয়ে উঠলো আবার অসাড় পেশীগুলো। দ্রুত ক্রল করে ঢুকে পড়লাম সুরঙ্গে।

'শেরিডান?' স্পষ্ট শুনলাম চিৎকারটা। রেসির গলা।

নিশ্চুপ পড়ে রইলাম ঝুল পাথটার নিচে।

'শেরিডান? আবার চিৎকার করে উঠলো রেসি।' 'ভেবো না কোটটা দিয়ে বোকা বানাবে আমাকে।'

অনেকক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। নীরব, নিস্তব্ধ।

'শেরিডান?' গলাটা অনিশ্চিত এখন। 'নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসো। তোমাকে উদ্ধার করতেই এসেছি আমি।' মিথ্যুক কোথাকার। না দেখেই বলতে পারি, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে কথা বলছে ও। 'ভুলটা আমাদেরই,' বলে চলেছে রেসি। 'তোমার হাতেই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছেন বস। বেরিয়ে এসো। একটা দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছি আমি।'

নিঃশব্দে কার্নিশটা কামড়ে এগোলাম খানিকটা। একটু পরই পায়চারির শব্দ শুনলাম ওপরে। রেসির চোখ দুটো তন্নতন্ন করে আমাকেই খুঁজছে এখন। সামনেই বাঁক নিয়েছে কার্নিশটা। আরও একটু এগোতেই গুলির শব্দ হলো হঠাৎ। মাথার ওপরে ঝুল পাথরে এসে বাড়ি খেলো গুলিটা। দ্বিতীয় গুলির আগেই চলে এলাম বাঁকটা পেরিয়ে।

ওখানেই শেষ কার্নিশটা। তারপরই সুড়ঙ্গের মতো একটা ফাটল। কিছুটা চিমনির মতো দেখতে। দুদিকের দেয়ালের দূরত্ব বড় জোর তিন ফুট। দেড়শো ফুট নিচের ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে ফাটলটা দিয়ে।

রেসির হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছা নেই ওপরে উঠে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম নিচে নামার।

এক লাফে চলে এলাম ফাটলটার কাছে। দুই প্রান্তে হাত রেখে শরীরটা গলিয়ে দিলাম নিচে। পিঠটা ঠেকালাম পেছনের দেয়ালে। তারপর হাঁটুদুটো ভাঁজ করে ঠেকালাম সামনেরটায়। এবার নামিয়ে আনলাম হাতদুটো। অপোজিশন অব ফোর্স ব্যবহার করে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম নিচে।

বেলির কথা মনে পড়লো। কাছাকাছি কোথাও আছে মেয়েটা। কলিনের কথাও ভাবলাম। বেঁচে আছি শুনলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? কি পদক্ষেপ নেবে এবার?

নিচের কয়েক ফুট বাকি থাকতেই ছেড়ে দিলাম শরীরটা।

চিন্তার ঝড় বইছে মাথায়। জীপে একটা ওয়াকি-টকি ছিলো। কিন্তু সেটা বেশ ক'মাইল দূরে। আমাকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলার আগে রেসি হয়তো কোনো সাহায্য চাইবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের নিয়ে সে-ও নামবে শিকার খুঁজতে।

বাঁচতে হলে এখন একটা অস্ত্রের প্রয়োজন আমার। ভীষণভাবে প্রয়োজন।

ভাবতে অবাক লাগে, ব্যস্ত বিরাট একটা নগরীর খুব দূরে নয় জায়গাটা। অথচ এর বন্য আদিমতার রূপটা পাল্টায় নি এতটুকু। সেই টুমদের পা রাখার দিনটা থেকে তেমনই রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত।

খোলা জায়গাটায় এসে মুহূর্তে ঠিক করে ফেললাম কোন্ দিকে যাবো। তারপর পা বাড়ালাম।

সাত

লস্ট রিভারের পথটাই ধরলাম। টুমির লেখা বর্ণনাটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। সামান্য উত্তরে। পাওয়ার হাউসটা যেখানে তৈরি হয়েছে, তার কাছেই।

নদীটা পাথুরে জলাশয় একটা। মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে। পাথরের বুক চিরে কিছুদূর এগিয়ে আবার হারিয়ে গেছে মাটিতেই। জল টুমি লিখেছে, পানিটা টলটলে—ঠাণ্ডা। দারুণ সুস্বাদু।

টুমির লেখা সবকিছুই পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো আবার। যদি তা করতে পারি, লেখার জন্য পুরো কাহিনীটা পেয়ে যাবো হয়তো।

কিন্তু লেখাটা এখন আর মুখ্য ব্যাপার নয় আমার কাছে। প্রতিশোধ চাই। জানতে চাই অত মরিয়া হয়ে কি লুকোতে চাইছে ওরা। সেটা প্রকাশ করে দিয়েই সমূলে ধ্বংস করবো ওদের।

কেন জানি না টুমিদের ওপর একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে আমার। অত্যন্ত সাহসী আর দৃঢ়চেতা লোক ছিলো ওরা। ঐতিহ্যবাহী খাঁটি আমেরিকান। আমার বিশ্বাস, খুন করে ওদের সর্বস্ব লুটে নেয়া হয়েছিলো অন্যায়ভাবে। আমি সেটাই প্রমাণ করে ছাড়বো।

একটু দম না নিলেই নয়। বসে পড়লাম একটা ছায়ায়। নিচে, সামনের দিকে খোলা বিস্তৃতি। এখন থেকে প্রতিটা পদক্ষেপ হিসেব করে ফেলতে হবে। কিছুতেই আর ধরা পড়লে চলবে না।

শরীর চাইছে না, তবু উঠে পড়তে হলো। কিছুদূর নেমে আসতেই পুরোনো একটা ইণ্ডিয়ান ট্রেইল চোখে পড়লো। এখানে সেখানে জড়ো হয়ে আছে কিছু কাঠ-কুঁদো। বৃষ্টির পানিতে ভেসে এসেছে ও গুলো। শক্ত দেখে একটা ডাল বেছে নিলাম। হাঁটার কাজে লাগবে। প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা চারপাশে। মাথার ওপর তাতানো রোদ। দরদর করে ঘাম নামছে জুলফি বেয়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে দ্রুত ওঠা-নামা করছে বুক। কিন্তু খেয়াল নেই সেদিকে। মাঝে মাঝে আপনা থেকেই খাড়া হয়ে উঠছে কান দুটো।

শিকারী কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। কোনো সুযোগ দেবে না এবার। দেখামাত্র গুলি করবে। কিন্তু এ রকম বিপদ এই প্রথম নয়। এর চেয়েও কঠিন বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাকে।

এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমেই হবে মেসা নদীর সেই উত্তুঙ্গ পাহাড়। অনেক আগে, একবার ঐ পাহাড়ের এক ক্যানিয়নে আটকা পড়েছিলাম আমি। দস্যু তস্করদের গা ঢাকা দেবার জন্য একটা গোপন জায়গা আছে ওখানে। ওখানেই যেতে হবে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কিন্তু তার আগে লস্ট রিভারটা খুঁজে বের করতে হবে। পানির এখন ভীষণ প্রয়োজন আমার।

হঠাৎ চমকে উঠলাম ক্ষুরের খটাখট শব্দে। একটা ক্রুদ্ধ গলাও শুনলাম। অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে কেউ।

চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পাশের ঝোপঝাড়গুলোর ওপর। হাত পড়লো মসৃণ গোল একটা পাথরে। মুঠোর চাইতে বড় হবে না পাথরটা।

কাছাকাছি ছোট্ট একটা গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এলো ঘোরসওয়ারীটা। পথটা চোখেই পড়ে নি আমার। চারদিকে একবার চোখ বুলালো লোকটা। তারপর পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে মন দিলো। আমার দিকে পেছন হয়ে আছে লোকটা।

মাঝের খোলা জায়গাটা লক্ষ্য করলাম ভালোভাবে। মাত্র কুড়ি গজ। ভিয়েতনামে এর চেয়েও কঠিন জায়গা চোখের পলকে পেরিয়ে গেছি। কিন্তু তখন ছিলো তারুণ্যের বয়স। সেই ক্ষীপ্রতা এখন আছে কি?

শরীরের প্রতিটা গ্রন্থি সজাগ রেখে সাবধানে একটা পা বের করলাম ডান দিকে। আরও সাবধানে শরীর আর অন্য পা-টাও বেরিয়ে এলো। সোজাসুজি চলে এলাম ওর পেছন দিকে। উঠে দাঁড়ালাম এবার।

বাতাসটা এমুখো। সৌভাগ্যই বলতে হবে। নইলে ঘোড়াটা টের পেয়ে যেতো। আরও দুতিন ধাপ এগিয়ে পাথরটা শক্ত করে ধরলাম মুঠোয়। হঠাৎ পাছা ঘুরিয়ে নাক ঝেড়ে উঠলো ঘোড়াটা। রাখঢাকের উপায় রইলো না আর। ছুটলাম ওর দিকে। আমাকে দেখেই ঝট করে পিস্তলের জন্য হাত নামালো সওয়ারীটা।

লোকটার ক্ষীপ্রতা সাধারণের চেয়ে ধীর। উঠে আসছে পিস্তলটা। ছুটন্ত অবস্থাতেই ছুড়ে মারলাম পাথরটা। কোনো প্রত্যাশা ছিলো না। ভেবেছিলাম পাথরের আঘাতটা এড়াতে একটু ঝুঁকে পড়লে কাছাকাছি যাবার একটু সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ভারী হাতুড়ির মতো ওর চোয়ালে গিয়ে লাগলো পাথরটা। পিস্তলটা

সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছিলো। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে গুলি বেরিয়ে গেলো একটা।

হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলো ঘোড়াটা। গুলিটা বোধহয় ঘাড়ের চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে। ছিটকে পড়লো লোকটা জিন থেকে। তিন লাফে পৌঁছেই প্রচণ্ড জোরে লাথি কষলাম আহত চোয়ালে। চোয়ালটা পাথরেই ভেঙেছিলো। লাথিটা চুরচুর করে দিলো।

আকাশ ফাটানো চিৎকার করে গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা। ঐ অবস্থাতেই পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিলাম। গুলির বেল্টটাও খুলে নিলাম কোমর থেকে। ফিরে তাকালাম না আর। ছুটলাম ঘোড়াটার দিকে। প্রায় একশো গজ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা। ভয় পেয়েছে। মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে খপ করে ধরে ফেললাম লাগামটা। স্যাডেল স্ক্যাবার্ডে রাইফেলটা দেখে খুশি হয়ে উঠলো মনটা।

গুলির শব্দে বিপদ এগিয়ে আসতে পারে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে উঠে বসলাম জিনে।

মেসা নদীর সহজ ট্রেইলটা না ধরে ঘুর পথে গ্রেপভাইন ক্যানিয়নের পথে ছোটালাম ঘোড়া।

গ্রেজ গালচের কাছে পৌঁছতেই দৃষ্টিটা আটকে গেলো ট্রেইলের ওপর। ক্ষুরের চিহ্ন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পেলাম মেয়েলী কণ্ঠটা।

'গুলিটা কি তুমিই করেছিলে?'

বেলির কণ্ঠ। ঘন একটা জুনিপার ঝোপের আড়ালে ঘোড়ার ওপর টানটান হয়ে বসে আছে ও।

'আমাকেই করার চেষ্টা করেছিলো।'

'মেরে ফেলেছো?'

'না। তবে চোয়ালটা গুড়িয়ে দিয়েছি। এ ঘোড়াটাও ওর।'

'যাচ্ছিলে কোথায় এদিকে?'

'রবার্স রুস্ট। বা ওদিকেই কোথাও।' বলে পেছন দিকটা দেখলাম একবার। 'এই অঞ্চলটা থেকে সরে যাওয়াই ভালো।'

'আমার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে?' অবাক হলো বেলি।

'আগেও তো ছেড়েছিলে। একজন ডেপুটি ইউ এস মার্শাল নিয়ে ফিরে আসবে। আমি হলে তাই করতাম।'

আর কোনো কথা বললো না বেলি। পাহাড়ের ছায়া বিছিয়ে আছে ট্রেইলটায়। চুপচাপ এগিয়ে চললাম আমরা। হঠাৎ মনে হলো, খুব ক্ষুধার্ত আমি। কাল থেকে কিছু পড়ে নি পেটে। চোঁ চোঁ করছে পেট।

স্যাডলব্যাগ হাতড়ে খাবার মতো কিছু পাওয়া গেলো না। কিছু দেশলাই আর গুলি পাওয়া গেলো মাত্র।

'এখন যত চিন্তা পিয়োকে নিয়ে।' নীরবতা ভাঙলাম আমি।

'পিয়ো?'

ক্যানিয়ন ধরে আরও এগিয়ে গেলাম ভেতরে। এর মধ্যে পিয়ো সম্পর্কে অনেক কিছুই বললাম বেলিকে। ভিয়েতনাম থেকে পালাবার সময় পিয়ো কিভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলো বলে গেলাম।

গোপন করতেও হলো অনেককিছু। ওসব হয়তো সহ্য করতে পারবে না মেয়েটা। বুঝবেও না। আরাম আয়েশে বসবাসকারীরা চিন্তাও করবে না ওসব কথা। জীবনের জন্য ছুটে বেড়ানো, সংগ্রাম

কতটা চরম হতে পারে, ওদের কল্পনারও বাইরে।

পিয়ো আর আমি মানুষ মেরেছি। আমাদের স্বাধীনতার মাঝে যারাই এসেছে, নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছি তাদের।

দু'দুটো ভাই খুন হয়েছে পিয়োর। কারা করেছে, কেন করেছে, ও জানে হয়তো।

'কিসে হাত দিয়েছে ওরা ধারণাও করতে পারে নি,' বললাম বেলিকে। 'পিয়োর মতো একজন সুদক্ষ গেরিলা যোদ্ধা আমি কমই দেখেছি। ওর অভিধানে ক্ষমা বলে কোনো শব্দ নেই।'

বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। পেয়ে গেলাম পাথুরে গুহাটা। লস্ট রিভারের উৎসটা ওখানেই। গাছ আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা পথ চোখে পড়লো। প্রায় প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু আরও একটা পথ থাকার কথা। সেটাই খুঁজছি। কোথায় কিভাবে খুঁজতে হবে স্পষ্টই বর্ণনা ছিলো টুমির ডাইরিতে।

অবাক হয়ে নদীটা দেখছে বেলি। বিস্ময়টা আমারও কম নয়। নদীটার দৈর্ঘ কয়েক গজ মাত্র। গুহাটার বাইরে এসেই ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে থাকা পাথরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপরই উধাও। 'জায়গাটা চেনো?' জিজ্ঞেস করলো বেলি।

শুনলাম কিন্তু সাথে সাথে জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ পর পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'জন বা ফ্লায়েড টুমির নাম শুনেছো কখনও?'

'টুমি? নাহ্।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখলো বেলি। তারপর বললো, 'কেন জানতে চাইছো?'

'সবকিছুর মূলেই ওরা দু'ভাই। নব্বই বছর আগে মারা গেছে।' কথার প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'তোমরা এখানে সেটেল হলে কি ভাবে?'

'অন্যান্য পায়ওনীয়ার পরিবাররা যে ভাবে হয়েছে। জায়গাটা

বোধহয় খুবই পছন্দ হয়েছিলো আমার পূর্ব পুরুষদের।'

'বাড়িটা কি নিজেরাই তৈরি করেছিলো?'

'না। শুনেছি অন্য একজন লোক তৈরী করে ছিলো ওটা। জায়গাটা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই আমার। তবে যেটুকু শুনেছি, কোনো রকম হাত বদল বা বিক্রির ঘোর বিরোধী ছিলো তারা। পরবর্তী সময়ে যখন উইল তৈরি করা হয়, সেখানেও বলা হলো, পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা। অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।'

'কি নাম ছিলো তোমার প্রপিতামহের?'

'খুব সম্ভবত ডসন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই আমার। এই সম্পত্তির ব্যাপারটাও চেপে রাখতো সবাই। তবে মা বাবার গোপন আলোচনার কিছু কথা শুনে ফেলেছিলাম একবার। এসব ব্যাপারে কখনও কৌতূহলী ছিলাম না আমি।'

'কর্মচারী লোকটার নাম মনে করতে পারো?'

'অবশ্যই। লোকটার নাম ছিলো ব্যাল মুর। সে-ই পত্তন নিয়ে তার মনিবকে ডিড করে দিয়েছিলো জায়গাটা।'

বেশি জায়গা নেবার ওটাই ফন্দি ছিলো তখন, ভাবলাম।

'ব্যাল মুরের কি হলো শেষ পর্যন্ত?'

'খুন হয়েছিলো অ্যাপাচিদের হাতে।'

ব্যাল মুরের নামটা ডায়রির ঐ পাতা কটায় অন্ততঃ বার দুয়েক উল্লেখ আছে। কাউহাণ্ড হিসাবে বেশ নাম ছিলো লোকটার। বিশ্বস্ত লোকটা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত টুমিদের সাথেই ছিলো।

জায়গাটা নিরাপদ নয় আমার জন্য। আলাপের মাঝেও ভুলি নি কথাটা। পথ খুঁজছি বেরিয়ে যাবার। লুকোবার মতো গোলকধাঁধার

অভাব নেই এখানে। কিন্তু রেসির মতো লোকের ওসব না জানার কথা নয়।

এর মধ্যে নিশ্চয়ই পালাবার সবকটা পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। ওরা জানে, আমরা বেরিয়ে যেতে পারলে সেটা ওদের জন্য কত বড় বিপদ।

বিপদ আমাদেরও। ফাঁদে আটকে গেছি। কিন্তু টুমির কথা যদি সত্য হয়, পথ একটা নিশ্চয়ই আছে। এবং সম্ভবত সেখানেই ধরা পড়েছিলো ও। কারণ লেখাটা এ পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে।

ডায়রিটা ধ্বংস হয়ে যাবে ভেবেই প্রয়োজনীয় পাতা কটা ছিঁড়ে ভাঙা পিস্তলের নলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। ভেবেছিলো, অকেজো পিস্তলটা হয়তো পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করবে না কেউ। শেষ বুদ্ধিটা কাজে লেগেছিলো ওর।

অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়ালাম। সময় খুবই কম। রাইফেলটা দিয়ে কতক্ষণ আর ঠেকানো যাবে। জন তুমিও ঠেকাতে পারে নি। পালাতে পারে নি জীবন নিয়ে। একই ফাঁদে আমরাও পড়েছি।

'ড্যান,' ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ বেলির। ওরা কি এখানেই খুন করবে আমাদের?'

'জানি না, বেলি। সত্যিই জানি না।'

আট

বেসিনের মতো দেখতে বড় একটা গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ওপর থেকে পানি পড়ে সৃষ্টি হয়েছে গর্তটা। অনেক বছর আগে ক্লিফ থেকে ঝর্ণার পানি গড়িয়ে পড়তো এখানে। তারপর ফাটল ধরে নেমে যেতো নিচে, ভ্যালিতে।

পাথরের মাঝে বড় বড় ফাটল আর বেসিনটা দেখে মনে হচ্ছে, এখানেই ট্র্যাপে পড়ে আহত হয়েছিলো জন টুমি। কিন্তু আহত হয়েও থামে নি সে। বেসিন উপচে পড়া পানির স্রোতটা যেসব ফাটল দিয়ে নেমে আসতো নিচে, সেই ফাটল ধরে এগিয়ে গিয়েছিলো আরও কিছু দূর। ভেবেছিলো, পানির এই স্রোতটা নেমে এসে লস্ট রিভারের সাথে একাকার হয়ে গেছে।

ডায়রির এই পৃষ্ঠাটায় দুটো দাগ দিয়ে রেখেছে জন টুমি। লেখা আছে ওখানে, পানি নামার সেই ফাটলটা ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে সে এখন।

উঠতে পেরেছিলো টুমি? সম্ভবত না। আর যদি উঠেও থাকে, ওখানেই খুন করা হয়েছিলো তাকে। কেন না এ সম্পর্কে আর কিছুই পাওয়া যায় নি ডায়রির পাতায়।

ওপরের দিকে তাকালাম। আর কত দেরি সন্ধ্যার? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলতে সুবিধা হবে আমাদের। কোনো রকমে একবার কেভ ক্রীক গ্রামে বা হাইওয়েতে পেঁছিতে পারলে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটা পথই বোধহয় বন্ধ করে দিয়ছে ওরা।

আরও একটা পথ আছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। আগুয়া ফ্রিয়া পাড়ি দিতে হবে সেই পথে। তারপর মেয়ার আর ডেওয়েতে পাওয়া যাবে জনবসতি। জায়গাটা চেনা আমার। ওখানে পেঁছিতে পারলেও যোগাযোগ করা যাবে টম রেলির সাথে। কিন্তু আগুয়া ফ্রিয়াটা দুর্গম এলাকা। অন্ধকারে বেলির পক্ষে সম্ভব নয় ওপথে যাওয়া। বাদ দিলাম চিন্তাটা।

গায়ে লাল রক্ত মেখে পাহাড়ের ওধারে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্যটা। আঁধার নামবে একটু পর। বাতাসে শীত শীত ভাব। খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এলাম রাইফেল হাতে। বেলি বসে রইলো ঝুল পাথরটার নিচে। নিস্তব্ধ, শান্ত প্রকৃতি। শুধু ঘোড়া দুটোর ঘাস ছেঁড়ার শব্দ ছাড়া আর টু শব্দটিও নেই কোথাও।

হঠাৎ একটা প্লেনের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বেলিও শুনলো শব্দটা। দৌড়ে এলো আমার পাশে।

'কয়োটি শিকার করছে কেউ,' ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো ও।

আমিও জানি প্লেন থেকে কয়োটি শিকার করা হয়। অনেক সময় মানুষও। কিন্তু শিকারের জন্য সুবিধার নয় এ অঞ্চলটা। বিশেষ করে টেক্সাস, ওকলাহোমা বা ক্যানসাসের মতো সমতল নয়।

অনেকদূর থেকে ঘুরে দক্ষিণে চলে গেলো প্লেনটা।

'এখান থেকে বেরোতে পারলে সোজা টম রেলির কাছে চলে

যাবে,' বেলিকে বললাম। 'ম্যানুয়েলের খুনের ব্যাপারটা তদন্ত করছে সে। এ পর্যন্ত যতটুকু জেনেছো সব বলবে তাকে।'

'পুরো ব্যাপারটা খুলে বলো ড্যান।'

'মনে হয় তুমিও শুনেছো ওদের কথা। আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে টুমি নামে দুজন লোক এসেছিলো এখানে। সঙ্গে ছিলো সাতাশ জন কাউহ্যাণ্ড আর চার হাজার গরু। ধারণা করছি ওদেরকে মেরে গরুগুলো লুটে নেয় কেউ। এই রিজিয়নে বড় একটা জায়গাও কিনেছিলো টুমিরা। ওটাও দখল করে নেয় খুনীরা এবং তখন থেকে ওখানেই আছে। জানি, জায়গাটা কখনও বিক্রি করবে না ওরা, পাছে এর আসল মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন জাগে কারও মনে। টুমিদের কোনো বংশধর বেঁচে থাকলে তারাও হয়তো জানে না তারা টুমিটের বংশধর। এমনকি টুমিদের কোনো জায়গা ছিলো এখানে, তাও জানে না। আমার বিশ্বাস, তখন থেকেই একটা আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে আসছে ওয়েলস পরিবার। ভয় করছে জায়গাটার হারাবার। আসল মালিকানাটা ফাঁস হয়ে যাবার। ওদের ভয়টা জায়গার মূল্যের চেয়েও বেশি। আরও একটা জিনিস বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে আমার, ধারণা করছি, তুমি টুমিদের কেউ হবে।'

অনেকক্ষণ হলো সূর্যটা ডুবে গেছে। আঁধার গ্রাস করেছে চারদিক। একটা তিতির ডেকে উঠলো কোথাও। সত্যিকারের তিতির।

'চলো বেলি, যাওয়া যাক,' ঘোড়ায় চড়ে বললাম।

জিনে চড়ে বসলো বেলি।

অন্ধকারে দশ গজের বেশি এগোচ্ছে না দৃষ্টি। ক্ষীণ একটা সুযোগ আমাদের। কাছাকাছি কেউ থাকলেও সুবিধা করতে পারবে না

গুলি ছুঁড়ে।

উঁচু-নিচু পাথরের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি এগোচ্ছি আমি আর বেলি। হাঁটিয়ে নিচ্ছি ঘোড়াদুটো। আরও মাইলখানেক যেতে হবে এভাবে। তারপর ভালো ট্রেইল পাওয়া যাবে একটা।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে নাক ঝাড়লো বেলির ঘোড়াটা। একটা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এলো জমাট অন্ধকার থেকে। খপ করে ছিনিয়ে নিলো বেলির হাতের লাগামটা।

কিছু বুঝে ওঠার আগে আরেকজন ছিনিয়ে নিলো আমারটা। সাথে সাথে গলা শুনলাম রেসির। খুব কাছে। 'রাইফেলটা ফেলে দাও, শেরিডান।'

দ্রুত একজন ঘোরড়সওয়ার ছুটে এলো আমার পাশে। ছোঁ মারলো রাইফেলটার দিকে। মরিয়া হয়ে উঠলাম আমি। প্রচণ্ড জোরে রাইফেলের বাট চালালাম ওর মাথা লক্ষ্য করে। বিশ্রী একটা শব্দ হলো খুলি ভাঙার। সেই সাথে মরণ চিৎকার। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি। পড়ে গেলাম জিন থেকে। দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেলাম কয়েকগজ। রাইফেলটা তখনও হাতে। আধামিনিট নিশ্চুপ পড়ে রইলাম ওখানে। তারপর উঠে পা টিপে টিপে এগোলাম ঢালের দিকে।

প্রায় একশো গজ দূরে মাথা সমান উঁচু একটা পাথরের আড়ালে এসে থামলাম।

'কোনদিকে গেলো! খোঁজো!' চিৎকার করে উঠলো রেসি।

'আগে আহত লোকটাকে দেখো, রোস।' বেলির কাঁপা গলা শুনলাম। লোকটা মনে হয় মরেই গেছে।'

চটাস করে চড় পড়লো বেলির গালে। 'চোপ! একটা কথা বললে

খুন করে ফেলবো।'

কিন্তু থামলো না বেলি। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'রেসি! কুত্তার.....'

'বাচ্চাটা' বলতে পারলো না বেলি। আবার চড় পড়লো ওর গালে।

মাথায় রক্ত উঠে গেলো আমার। অজান্তে আঙ্গুলটা চলে গেলো রাইফেলের ট্রিগারে। একশো গজ আমার কাছে কিছুই না। সিগারেটের মাথার আগুনও ফেলে দিতে পারি আমি এখান থেকে। কিন্তু দমে গেলাম রেলির কথা ভেবে। অন্ধকারে কে কোথায় দাঁড়ানো, জানা নেই।

'রেসি,' খনখনে গলায় বললো কেউ, 'মেয়ে শিকার করার জন্য ভাড়া করা হয় নি আমাকে। শেরিডান কোথায় গেলো দ্যাখো।'

হাঁটতে শুরু করলাম আবার। বেলির চিন্তাটা দূর করে দিলাম মন থেকে। নিজেকে বোঝালাম, আমার পালিয়ে যাওয়ায় বেলিকে খুন করার ঝুঁকিটা নেবে না ওরা। হয়তো এটা একটা সান্ত্বনা আমার। কিন্তু এছাড়া আর কিই বা করার আছে এই মুহূর্তে।

ক্রিমিনালদের ব্যাপারে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় একটা কথাই জেনেছি, অত্যন্ত অহংসাদী আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয় ওরা। মর্জিমাফিক কাজ করে, এবং মনে করে, যা করছে সবই নির্ভুল। এ ব্যাপারে আইন-ফাইনের তোয়াক্কা করে না কখনও।

টম রেলির মতো বিচক্ষণ একজন পুলিশ অফিসার সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও নেই কলিনের। আমাকেই সন্দেহ করেছিলো সে ম্যানুয়েলের খুনের ব্যাপারে। হয়তো ওয়েলসদের র‍্যাঞ্চে পিটের মৃত্যু নিয়েও এখন বিরাট একটা প্রশ্ন জাগবে তার মনে। হাঁটতে শুরু

করবে আমার ব্যাক গ্রাউণ্ড। সহজেই বের করে ফেলবে আমার ভিয়েতনাম সার্ভিসের সবকিছু। শুধু তাই না, পাশাপাশি পিয়োর মিলিটারী রেকর্ডও এসে যাবে পুলিশের হাতে।

এরমধ্যে কলিনও একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলির সামনে। কিন্তু কলিনের সেটা বোঝার উপায় নেই। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে, আমাদের পালানোকে কেন্দ্র করে তদন্ত একটা হবেই। হয়তো কিছু সাক্ষীও জোগাড় করে ফেলবে তার পক্ষে। ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করবে সবকিছু। যদিও সে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, তারপরও র‍্যাঞ্চের মালিকানার রহস্যটা থেকে যাবে। হয়তো সেই রহস্য ধরেই বেরিয়ে পড়বে আসল মালিকানা।

পাথুরে এলাকাটা পেরিয়ে চিন্তা করলাম কোথায় যাবো। টম রেলির কাছে খবর অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কোথায় পাওয়া যাবে টেলিফোন? কলিনের র‍্যাঞ্চ প্রায় কুড়ি মাইল। কাছে হলেও লাভ নেই। ওরা সবাই অ্যালার্ট এখন।

জিমারম্যানের বার-বেল র‍্যাঞ্চের কথা ভাবলাম। ওটাও মাইল পনেরোর কম নয়। ওখানেও লোক আছে। তবে ওৎ পেতে নেই কেউ।

জিমারম্যান আর কলিনের মাঝেরটা হচ্ছে বেলিদের র‍্যাঞ্চ। খালি বাড়ি। ফোন আছে কিনা জানা নেই।

জিমারম্যানের ওখানে যাওয়াই ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ। তারপর অন্ধকার। অনুমান করলাম, যদি পড়ে গিয়ে হাত পা না ভাঙে, দুটোর আগেই পৌঁছে যাবো।

কেভ ক্রীক অনেক বাঁয়ে রেখে ক্যাম পাহাড়ের পুরানো ট্রেইলটা ধরলাম। কিছুক্ষণ হেঁটে এবং কিছুক্ষণ দৌড়ে যখন বুলডগ মেসায়

এসে পৌছলাম, রাত তখন বারটা।

ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়েছে শরীরটা। রাইফেলটার ওজনও যেন বেড়ে গেছে দশগুণ। ইচ্ছা হলো কিছুক্ষণ রেস্ট নেই। কিন্তু জানি, এখন রেস্ট নিতে গেলেই ঘুম আসবে দু'চোখ ভেঙে। যে ঘুম আর ভাঙবে না কোন দিন। নানান চিন্তার মধ্যে কয়োটি আর পাহাড়ী সিংহের কথা ভুলি নি একবারের জন্যও।

বুলডগ মেসা থেকে নামার পর ভালো পাওয়া গেলো ট্রেইলটা। তবুও প্রায় তিনটা বেজে গেলো জিমারম্যানের বাড়ি পৌছতে।

দেশীয় পাথরে তৈরি বিরাট বাড়ি। পশ্চিমের পাহাড়টার দিকে মুখ করা। জিমারম্যান নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে। কুকুরও থাকতে পারে দু'একটা। কিন্তু সাড়াশব্দ পাই নি এ পর্যন্ত।

আস্তাবলের পেছন দিয়ে ঘুরে চলে এলাম নিচু পাঁচিলটার কাছে। ভোর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসেও ঘামছি দরদর। বেশ বেগ পেতে হলো বুক সমান উঁচু পাঁচিলটা টপকাতে।

দ্রুত চলে এলাম লনিতে। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেলো কাচের স্লাইডিং দরজাটা। র‍্যাঞ্চ কানট্রিতে প্রায় ঘরেই তালা ব্যবহার করা হয় না।

ভেতরে ঢুকে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখলাম দরজার পাশে। ওয়েস্টব্যাণ্ডের পিস্তলটা রেডি। অন্ধকার ঘর। কিন্তু এক মিনিট পরীক্ষা করেই বুঝলাম, এক সেট সোফা, সাইড টেবিল আর একটা টিভি সেট আছে ঘরটায়।

আরও একটা দরজা পেলাম উল্টো পাশে। খোলা। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। বার রুম। টেবিলেই পাওয়া গেলো ফোনটা। রিসিভার তুলতেই অপারেটরের গলা শোনা গেলো অপর প্রান্তে।

'বার-বেল ব্যাঞ্চ থেকে বলছি। এভারগ্রীন ব্যাঞ্চে একটা খুন হতে যাচ্ছে। প্লিজ রিপোর্ট টু টম রে—,'

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেলো ঘরটা।

'রিসিভারটা টেবিলে রাখো—সাবধানে।'

শাসানির সুরে বললো কেউ। না তাকিয়েই বুঝলাম ডোরিস ওয়েলস। হাতে পিস্তল আছে তাও জানি।

রিসিভারটা ক্র্যাডেলে রাখতে যাচ্ছি দেখে ঝট করে এগিয়ে এলো ডোরি। ছোঁ মেরে তুলে নিলো। পিস্তলটা তাক করে রেখেই কানে লাগালো। বললো, 'একটা পার্টি চলছে। কয়েকজন গেস্ট একটু বেশি বেসামাল হয়ে পড়েছে। জোক করছে ওরা। দুঃখিত।'

ডোরি যখন কথা বলছে, ধীরে ধীরে আমার ডান হাতটা চলে গেলো ওয়েস্টব্যাণ্ডের কাছে। এক পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলো ও। কিন্তু চেয়ার ছিলো পেছনে। পায়ে বেধে উল্টে পড়লো চেয়ারটা সহ। ডাইভ দিয়ে পড়লাম ওর ওপর। কব্জি ধরে মোচড় দিতেই ছেড়ে দিলো পিস্তলটা।

উঠে দাঁড়ালাম। পাতলা স্লিপিং গাউনটা কোমর পর্যন্ত উঠে গেছে ডোরির। ঠিকঠাক করে উঠে দাঁড়ালো।

'কি আশা করছো তুমি, ফুলিশ রাইটার। কি হবে টেলিফোন করে?'

'টম রেলিকে জানাতে চেয়েছিলাম, আমাকে খুন করার যে প্ল্যানটা করেছিলে তোমরা, সেটা ব্যর্থ হয়েছে।'

'এখনও তুমি আমাদের হাতের মুঠোয়। গরু চোর সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। আমাদের জায়গায় এলে ফিরে যেতে পারে না কেউ।'

'তোমাদের জায়গা?'

ভুরু কুঁচকে তাকালো ডোরি। 'আমাদের জায়গা!' রিপিট করলো ও।

'মনে রেখ ডোরি, আমাকে খুন করলেও শেষ রক্ষা হবে না তোমাদের। এ পর্যন্ত যতটুকু লিখেছি, সব পৌঁছে গেছে আমার পাবলিশারের কাছে। কাহিনীটা শেষ করার জন্য দরকার হলে অন্য লেখকের হাতে তুলে দেবে সে। সুতরাং যে বইটা তোমরা বন্ধ করার চেষ্টা করছো, সেটা প্রকাশ হবেই।'

'কক্ষনো নয়।' আমার কাঁধের পেছন থেকে বললো কেউ। 'ড্রপ দ্য গান, শেরিডান।'

অর্ধেক ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম দেয়ালের দিকে। ঘাড়টা কাত করে তাকালাম আদেশকারীকে দেখার জন্য। জিমারম্যান। হাতে উদ্ধত শটগান। হেসে বললাম, 'অনেক সিনেমা দেখেছো তুমি, জিমারম্যান। সিনেমায় আদেশ করার সাথে সাথেই পিস্তল ফেলে দেয় সবাই, তাই না। কেননা গল্পগুলো যারা লেখে, জীবনেও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় নি তারা। আমি তা করবো না? জিমারম্যান। যদি গুলি করো, ডোরিও মারা যাবে। কমপক্ষে তিনটা গুলি করবো আমি। ডোরিকে দুটো আর একটা তোমাকে।'

'ড্রপ ইট!' আবার আদেশ করলো জিমারম্যান। কিন্তু গলাটা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত শোনালো এবার।

'গুলিটা মুখে খেতে চাও ডোরি? শটগানটা যেভাবে ও ধরে রেখেছে তাতে শুধু আমার একাই নয়, তোমাকে নিয়েও টানাটানি লেগে যাবে দেখছি। জানিনা, কেমন পাকা হাত ওর। কিন্তু আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। আমি গুলি খাবো ঠিকই, কিন্তু তোমাদের নিয়ে যাবো সাথে।'

থমথমে নীরবতা নেমে এলো ঘরের ভেতর। জানি, গুলি করার সাহস হবে না জিমারম্যানের। ভাবছে ও, আমার কথা আট আনা সত্য হলেও মারা যাচ্ছে ডোরি। জবাবদিহি করতে হবে কলিনের কাছে।

'কলিন কোথায়, ডোরি?'

'এখানেই আছে।'

'থাক, ভালোই হলো। সবাইকে পাওয়া যাবে একসাথে। পুলিশ এসে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে। জেরা করবে—তল্লাশী চালাবে। কি জবাব দেবে ঠিক করে রাখো।'

'তোমার মেসেজটা পেঁাছায় নি অপারেটর।' বলতে বলতে টেবিলটা ঘুরে জিমারম্যানের কাছে যাবার চেষ্টা করলো ডোরি। আমিও ঘুরলাম ওর সাথে সাথে। হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম সবাই। ধীরে ধীরে কাছে আসছে শব্দটা।

'পুলিশের গাড়ি,' বললাম। কিন্তু আমার নিজের কাছেই বিশ্বাস হলো না কথাটা।

জানালার দিকে মাথাটা ঘোরালো জিমারম্যান। শটগানের ব্যারেলটা নিচের দিকে ঝুঁকে গেলো একটু।

এটুকুই যথেষ্ট আমার জন্য। সাবধান করারও সময় পেলো না ডোরি। তার আগেই কাঁধ দিয়ে সবেগে ধাক্কা মারলাম জিমারম্যানকে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো ওর দেহটা। একমুহূর্ত সেঁটে রইলো সেখানে। তারপর ভাঁজ হয়ে গেলো পা দুটো।

দরজার কাছে রেখে যাওয়া রাইফেলটা তুলে দ্রুত বেরিয়ে এলাম লবিতে। ভেতরে চেঁচাচ্ছে ডোরি।

মেইন গেটটা খোলা। অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে জীপটা। চিৎকার শুনে কিছু একটা সন্দেহ করেছে আগন্তুক।

জীপটা আরও একটু সরিয়ে সরাসরি বাড়িটার ওপর আলো ফেলার চেষ্টা করছে সে। এক্ষুণি দেখতে পাবে আমাকে।

ঝট করে সরে গেলাম একটা খামের আড়ালে। ওখান থেকেই ডোরির পিস্তলের ম্যাগাজিনটা খালি করলাম উইণ্ডস্ক্রীন আর হেডলাইট দুটো লক্ষ্য করে। ঝন ঝন করে শব্দ হলো কাচ ভাঙার। দপ করে নিভে গেলো আলোটা। আর্তনাদ করে উঠলো হুইলে বসা লোকটা। সাথে সাথে স্টিয়ারিংটা ঘুরে গেলো বাঁ দিকে। স্পীড বেড়ে গেলো আরও। দ্রুত ছুটে আসছে জীপটা বাড়ির দিকে।

একছুটে বেরিয়ে এলাম লবি থেকে। পাঁচিল টপকাবার সময় শুনতে পেলাম শব্দটা। পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো জীপটা।

একদৌড়ে চলে এলাম আস্তাবলটার পেছনে। ওখান থেকে ছুটলাম পাহাড়ের দিকে।

পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম একটা ঝোপের আড়ালে। তাকালাম বাড়িটার দিকে। বাতি জ্বলছে সবগুলো ঘরে। লবিতেও। হৈ চৈ শোরগোল হচ্ছে প্রচুর। সবকিছু ছাপিয়ে ডোরির তীক্ষ্ণ কণ্ঠটা শোনা যাচ্ছে বেশি। তর্ক করছে কারও সাথে। বোঝাতে চাইছে।

হঠাৎ একটা রাইফেল গর্জে উঠলো পাহাড়ের বেশ ওপরে। জীপে গিয়ে আঘাত করলো গুলিটা।

ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে জিমারম্যানের বাড়িতে। ছোটাছুটি করে শেল্টার নিচ্ছে সবাই। চিৎকার শোনা গেলো ডেরির, 'ওটা শেরিডান নয়! বিশ্বাস করো সবাই, শেরিডান নয়! রাইফেল ছিলো না ওর সাথে!'

দ্বিতীয় গুলিটা হলো মিনিট তিনেক পর। তার একমিনিট পর

তৃতীয়টা। হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাঙ্ক। মুহূর্তে আগুনে ঢেকে গেলো জীপটা। আশপাশটাও জ্বলে উঠলো ছিটকে পড়া পেট্রোলে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবলাম, নিশ্চয়ই পিয়ো। ওদেরকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখতে চাইছে ও।

ঢাল ধরে উঠতে শুরু করলাম ওপরে। কিছুদূর উঠে আবার তাকালাম বাড়িটার দিকে। এখনও জ্বলছে জীপটা।

হঠাৎ মনে হলো, ভীষণ ক্ষুধার্থ আমি। ক্লান্ত। ঘুমোনোর জন্য নিরাপদ একটা জায়গা চাই। আর চাই খাবার। যেভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে।

আরও একটা কথা মনে হলো। পাহাড়ের পাদদেশে, ওপরে ওঠার ট্রেইলটা যেখানে শুরু, কতগুলো পাথর সাজানো ছিলো ওখানে। বাড়ির আলোটা আবছাভাবে এসে পড়েছিলো, লক্ষ্য করি নি ঠিকমতো। মনে করার চেষ্টা করলাম, কিভাবে সাজানো ছিলো ওগুলো? ইংরেজি উল্টো ভি অক্ষরের মতো? তাই তো? এতক্ষণে মনে পড়েছে সাইনটা। ফক্স কোম্পানীর পরিচিত সাইন। কোম্পানী অথবা ব্যাটেলিয়ন এরিয়া নির্দেশ করে এটা। ক্যাম্প আছে আশে পাশে। নিশ্চয় পিয়ো আছে সেখানে। প্রলুব্ধ করছে আমাকে ওপরে ওঠার। খাবার পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে রেস্ট। কিন্তু কোথায় আছে পিয়ো? কতদূর? শরীরটা টেনে তুলতে পারবো তো?

পরপর দুটো কল পেয়েছে অপারেটর। কোন্‌টা বিশ্বাস করবে সে? সম্ভবত ডোরিরটা। গ্রামীন এলাকার অপারেটররা সাধারণত চেনে সবাইকে। কটাই বা লাইন আছে এখানে! ডোরির গলা না চেনার কথা নয় তার।

চূড়োর কাছাকাছি পৌঁছে অসাড় হয়ে এলো শরীরটা। আর পারছি না। একটু রেস্ট না নিলেই নয়। বসে পড়লাম ওখানে। বাতাস বইছে জোর। ঠাণ্ডাটাও বেশ। র‍্যাঞ্চ হাউসের লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। জীপের আগুনটা নিভে গেছে।

লাল রঙ ধরতে শুরু করেছে পুব আকাশটা। তারই আভা এসে পড়েছে পাহাড়ের চূড়োয়। পাশেই একটা ফাটলের মতো দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লাম সেখানে। ধীরে ধীরে ভারী হয়ে এলো চোখের পাতা দুটো। পাঁচমিনিটের মধ্যেই ঢলে পড়লো ক্লান্ত শরীরটা।

হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দে ভেঙে গেলো ঘুমটা। ভোরের আলো ঝলমল করছে চারদিকে। ঘড়ি দেখলাম চট করে। সাড়ে সাতটা। পড়ে রইলাম চুপচাপ। বাতাসের একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। কিন্তু ভুল শুনেছি আমি। নিশ্চয়ই একটা শব্দে ঘুম ভেঙেছে আমার। হঠাৎ আবার শুনলাম শব্দটা। আমার বাঁয়ে। বড়-জোর দশগজ দূরে। কাঁটা দিয়ে উঠলো সারা শরীর। ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে গেলো পেটের ভেতর। একটু উঁচু করলাম মাথাটা।

মানুষ নয়। পাহাড়ী সিংহ বা কয়োটিও নয়। প্রেমলীলায় মত্ত দুটো তিতির। ওদেরই পুর রাগের শব্দ।

ফাটলটা থেকে বেরিয়ে উঁকি দিলাম নিচে। ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে জীপটার। কিন্তু জন-মানবের চিহ্ন নেই কোথাও। মিনিট খানেক পর হঠাৎ একটা লোক বেরিয়ে এলো বাঙ্ক হাউস থেকে। থেমে এদিক ওদিক তাকালো কয়েকবার। ঝুঁকে মাটি পরীক্ষা করলো, ট্র্যাক খুঁজলো, তারপর আস্তাবলের দিকে চলে গেলো ধীরে ধীরে।

একটু পিছিয়ে এসে পাহাড়টার অবস্থানটা লক্ষ্য করলাম ভলোভাবে। সামনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাদদেশ পর্যন্ত। কিছুদূর সমতল

জায়গা। তারপর জিমারম্যানের বাড়ির সীমানা। অপর পাশটাও ক্রমশ ঢালু হয়ে একাকার হয়ে গেছে ভ্যালির সাথে। গরু চরে ওখানে। ট্রেইলও দেখা যাচ্ছে একটা। বেলিদের র‍্যাঞ্চের পাশ দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা।

চূড়োটার এই দিকটায় কাল রাতে ছিল পিয়ো। কিন্তু এখনও থাকবে, এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। যতটুকু জানি, এক জায়গায় থাকার মানুষ নয় ও। অনেক ডেরা আছে ওর লুকোবার। দুদিনের বেশি থাকে না কোনোটায়।

আড়াআড়িভাবে কিছু দূর এগোলাম উত্তর পশ্চিম দিকে। তারপর নামতে শুরু করলাম পাহাড়ের অপর পাশে। পিয়োর সাইনটা যেখানে ছিলো, ঠিক তার উল্টোদিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন গাছগাছালির মধ্যে চলে এলাম। সিডার পাহাড়ের ওপরটা বারোমাসই এমন থাকে। ঝোপঝাড় ছাড়াও আছে অসংখ্য সিডার আর পাইন গাছ।

হঠাৎ থমকে গেলাম নতুন কতগুলো ছাপ দেখে। শিশিরের ওপর পড়েছে ছাপগুলো। তার মানে সকালেই, সম্ভবত মিনিট দশেক আগে এখানে হাঁটা-চলা করেছে কেউ।

'হেই, ক্যাপ্টেন।'

ঝট করে ঘুরে তাকালাম।

পিয়োর মধ্যে মেক্সিকানদের চেয়ে অ্যাপাচিদের হাব ভাবটাই বেশি সুস্পষ্ট। শক্ত। পেটানো শরীর। চোখে মুখে রুক্ষ জীবনের ছাপ। পিয়ো সম্পর্কে একটা ভয় ছিলো আমার। বরাবরই ফুর্তিবাজ আর অস্থির চিত্তের লোক। সবকিছুতে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব। আমার সম্পর্কে ওর কি ধারণা জানতে পারি নি কোনদিন। কিন্তু ভিয়েতনামে

ওর মত এত ঘনিষ্ঠজন আর কেউ ছিলো না আমার।

'বিপদে পড়েছো, ক্যাপ্টেন?' পায়ের ওপর বসে বললো পিয়ো। হাতে বানানো একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরলো আমার দিকে।

'খাই না।'

'ওহ্ হো।' হাসলো পিয়ো। 'ভুলেই গেছিলাম। ভিয়েতনামে এই একটা জিনিস কখনও শেয়ার করি নি আমরা।' সিগারেটটা ধরানোর জন্য একটু থামলো ও। ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'এখন তো ফি তুমি, তাই না? চলে যাচ্ছো?'

'বেশি ডসন বন্দী ওদের হাতে। মেরে ফেলবে মেয়েটাকে।'

'সিওর।' মাথা ঝাঁকালো পিয়ো। 'মেরে ফেলবে। এই র‍্যাঞ্চটা ওর। ওর বোনকেও মারা হয়েছে এখানে।'

'অ্যাক্সিডেন্টে মরে নি?'

নিঃশব্দে হাসলো পিয়ো। 'অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অনেক। অকি ওয়েলসও মারা গেছে ওর সাথে।'

'তাই?'

মাথা ঝাঁকালো পিয়ো অ্যালভারেজ। 'দুতিন দিন গোপনে লক্ষ্য করলো ওরা, রোজ বিকেলে গাড়িতে চড়ে কোথায় বেড়াতে যায় মেয়েটা। কলিন, অকি আর জিম্বো। আমি দেখেছি ওদের, ওয়াচ করেছি। একদিন অকি ওয়েলস এলো মেয়েটার সাথে। দেখলাম, ঝট করে খুলে গেলো অকির পাশের দরজাটা। ঘাড় কাত করে মেয়েটাকে কিছু বললো সে। পরমুহূর্তেই লাফ দিতে গেলো খোলা দরজা দিয়ে। পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরলো মেয়েটা। নামতে পারলো না অকি। গাড়ি সহ দু'জন চলে গেলো হাজার ফুট নিচে।'

'সত্যি দেখেছো?'

'সিওর, ক্যাপ্টেন।'

'রিপোর্ট করো নি কেন?'

এমন ভাবে তাকালো পিয়ো, যেন বোকার মতো কিছু বলে ফেলেছি আমি। 'আইন শুধু আমাকেই দেখতে পায়, ক্যাপ্টেন। আঠার মতো আমার পেছনে লেগে আছে কলিন।'

নীরবে সিগারেট টানছে পিয়ো। চোখের দৃষ্টিটা এক সেকেণ্ডের বেশি স্থির থাকছে না এক জায়গায়।

'যেভাবেই হোক বেলিকে উদ্ধার করতে হবে, পিয়ো। বাকি কজনকে তুলে দেবো আইনের হাতে।'

'ওরা নিজেরাই আইন, ক্যাপ্টেন। আইন তৈরি করে ওরা।'

'দিন শেষ হয়ে গেছে ওদের। ম্যানুয়েলের খুনের তদন্ত করছে যে অফিসারটা, টম রেলি, মনে হয় তার দৃষ্টি আছে এদিকে।'

'আমি চিনি ওকে।'

উঠে দাঁড়ালো পিয়ো। 'চলো, ক্যাপ্টেন।' আঁকাবাঁকা পথ ধরে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করলো ও।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে এলাম পিয়োর সবচেয়ে কাছের ডেরাটার সামনে। একটা গুহা। চারপাশে পাথরের বড় বড় চাঁই আর গাছপালা। একটা নিচু ডাল প্রায় ঢেকে রেখেছে মুখটা। বাইরে থেকে এরকম একটা জায়গার কথা চিন্তাও করা যায় না। ভালো কোন বন্দুকবাজের পক্ষেও এখানে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া পালাবার পথও আছে বেশ ক'টা। সবগুলোই ঘোরানো প্যাঁচানো। অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো দেখতে।

একটু এগিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। বেশ প্রশস্ত ভেতরটা। কুড়িজন লোক বসতে পারবে অনায়াসে। দেয়ালে প্রাচীন কালের

রান্না বান্নার কালিঝুলি। তারমাঝেও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের পিকচার রাইটিঙগুলো।

'আমার পিতামহ এই গুপ্ত জায়গাটার কথা বলেছিলো আমাকে,' বললো পিয়ো। 'অ্যাপাচিরা ব্যবহার করতো এটা।'

'কলিনরা জানে এটার কথা?'

দাঁত বের করে হাসলো পিয়ো। 'আমার মতো ইণ্ডিয়ান নয় ওরা। ইণ্ডিয়ানরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।'

নয়

গুহায় ঢুকে আগুন জ্বালালো পিয়ো। একটা গরুর রান ঝুলছে এক পাশে। বড় এক টুকরো মাংস কেটে তাকালো আমার দিকে। দেঁতো হাঁসি হেসে বললো, 'কলিনের গরু, খাবে?'

জবাবের অপেক্ষা না করে আগুনের ওপর ধরলো টুকরোটা। উল্টে পাল্টে সেঁকতে লাগলো।

একটু বিশ্রাম পেয়ে ভারী হয়ে এলো চোখ দুটো। এই প্রথম অনুভব করলাম, কত ক্লান্ত আমি।

'টুমিদের ব্যাপারে উৎসাহী তুমি?'

জোর করে খুললাম চোখ দুটো। 'কতটুকু জানো ওদের সম্পর্কে?'

নড়েচড়ে বসলো পিয়ো। 'গরুর পাল নিয়ে এখানে আসে টুমিরা। আমার পিতামহের বয়স তখন নয় কি দশ বছর। বন্ধুদের

সাথে পাহাড়ে খেলছিলো সে। জোয়ারের পানির মতো আসতে শুরু করে গরুর পাল। আসছে তো আসছেই। যতদূর দেখা যায় শুধু গরু আর গরু। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদী পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাটা ভরে গেলো হাজার হাজার গরুতে। অসময়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো সে বছর। ভালো ঘাস জন্মেছিলো ভাডের পাড়ে। তারপর এলো একটা ওয়াগন। লম্বা চওড়া সুদর্শন এক লোক নামলো ওয়াগন থেকে। জন টুমি। টুমির পৌঁছার আগেই সাজ-সাজ একটা রব উঠেছিলো আরিজোনায়। এই কালজয়ী পুরুষকে এক নজর দেখার জন্য অনেক ভিড় হয়েছিলো সেদিন ভাডের পাড়ে। ওয়াগন থেকে নেমে চারপাশে তাকালো টুমি। চোখ পড়লো এই ইণ্ডিয়ান ছোট্ট ছেলেগুলোর ওপর। ঘোড়ায় চড়ে সোজা পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালো জন টুমি। মাটিতে কয়েকটা প্যাকেট নামিয়ে রেখে ডাকলো ওদের। বোকার মতো মুখ দেখাদেখি করলো আমার পিতামহ ও তার বন্ধুরা। তারপর ভয়ে ভয়ে নেমে এলো পাহাড় থেকে। মাটিতে রাখা তামাক আর লবনের প্যাকেট দেখলো। আর দেখলো কয়েকটা জ্যাক-নাইফ। এর আগে ভাঁজ করা ছুরি দেখে নি তারা। ছেলেগুলোকে কাছে ডাকলো টুমি। ওদের বাবাদের খবর দিতে বললো। আরও বললো, টেক্সাস থেকে জন টুমি তাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে।'

ডায়রির আরও কিছু অংশের কথা মনে পড়লো আমার। ঠিক তাই। টুমিরা জানতো, ইণ্ডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া ছাড়া এখানে বসবাস করতে পারবে না ওরা।

ইণ্ডিয়ানদের সাথে দেখা করলো টুমিরা। কথা বললো। লিডার-দের দাওয়াত করে উপহার সামগ্রী বিতরণ করলো। ধীরে ধীরে

একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো ওদের মধ্যে। তারপর খামার করার জন্য বড় একটা জায়গা কিনে ফেললো একদিন। ইণ্ডিয়ানদের দখলে ছিলো জায়গাটা। গরুর চামড়ার ওপর লেখা চুক্তিপত্র দেয়া হলো টুমিদের। জায়গাটার সীমানাও উল্লেখ ছিলো তাতে।

কিন্তু বিচক্ষণ টুমি জানতো, ইণ্ডিয়ানরাই আসল মালিক নয় ওটার। জমির দরকার ছিলো, পেয়ে গেছে। চুক্তিপত্রও পেয়েছে একটা। তবে পশ্চিমাদের এই প্রাচীন চুক্তিপত্রের পদ্ধতিটা পছন্দ হলো না টুমির। দিন অনেক বদলে গেছে। এতে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকে অনেক ক্ষেত্রে। যে কোনো দিন আসল দাবিদার এসে দাবি করতে পারে। তার উত্তরাধিকাররা যাতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য মালিকানাটা আরও পাকাপোক্ত করতে চাইলো টুমি।

গোপনে খোঁজ নিতে শুরু করলো আসল দাবিদারদের। প্রায় চার মাস পর টুকসনে পাওয়া গেলো তাদের। একটা মেক্সিকান পরিবার। স্প্যানিস গভর্ণমেন্ট থেকে জায়গাটা অনুদান পেয়েছিলো তারা। ক্লায়েড টুমি গেলো সেখানে। কিনে আনলো মেক্সিকান পরিবাররে দাবিটা।

কাহিনীটা আংশিক জানে পিয়ো। শুধু জানে, টুমি টুকসনে গিয়েছিলো একবার এবং কিছুদিন পর ফিরে আসে। মেক্সিকান পরিবার থেকে দ্বিতীয়বার জায়গাটা কেনে টুমিরা, একথা জানে না ও।

এরই মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যায় সেখানে। টুমিদের কিছু সংখ্যক কাউহ্যাণ্ডকে জোর করে বিতাড়িত করা হয় আরও পশ্চিমে। দু'জন খুন হয় ভার্ডের পাড়ে।

অ্যাপাচিদের হাত ছিলো না এই গোলমালে। যদিও ওদেরকে দায়ী করে অনেকে।

'ওয়েলসদের কেউ জড়িত ছিলো এই খুনের সাথে?' জানতে চাইলাম।

'ছিলো। তবে ওয়েলস না। লোকটার নাম ছিলো মারভিন টেল্‌স। যেমন মোটা তেমনি শক্তিশালী। এসেছিলো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।' দাঁত বের করে হাসলো পিয়ো। 'ইণ্ডিয়ানরা বলে কম, শোনে বেশি। শুনেছি, খুনের দায়ে পালিয়ে এসেছিলো সে। এখানে এসে বিয়ে শাদী করে হয়ে গেলো মারভিন ওয়েলস। জন রেসি নামে একজন লোকের সাথে পরিচয় মারভিনের। দু'জনের চিন্তা ভাবনা ছিলো এক—কিভাবে টুমিদের জায়গাটা আর গরুগুলো আত্মসাত করা যায়। প্রথমে খুন করলো ক্লায়েড টুমিকে। লাশ পাওয়া যায় নি তার। তারপর টুকসন থেকে ভাড়া করে আনলো সেরা সেরা বন্দুক-বাজদের। শেষ করলো বাকি ক'জনকে। এটা সাদা চামড়াদের গোলযোগ, ক্যাপ্টেন। অ্যাপাচিদের নিজেদেরই অনেক সমস্যা আছে।'

'বেলিরা এর সাথে জড়ালো কিভাবে?'

'খুব সুদর্শন এক যুবক ছিলো। নাম ব্যাল মুর। যুদ্ধ শেষ হবার পর আরিজোনা ছেড়ে চলে যায় সে। ফিরে আসে অনেকদিন পর। সঙ্গে একটা ফুটফুটে বাচ্চা। এসেই তার এবং বাচ্চাটার নামে একটা অংশ দাবি করে বসলো সে।'

'বুড়ো বয়সে অ্যাপাচিদের হাতে মারা যায় ব্যাল মুর, তাই না?'

'ওরকমই বলে ওরা। সব দোষ চাপায় অ্যাপাচিদের ঘাড়ে। দুই একজন ছাড়া কেউ জানে না আসল ঘটনাটা। মারভিনের একটা পা খোঁড়া করে দিয়েছিলো ব্যাল মুর। তার কিছুদিন পর মুরকে খুন করে বদলা নেয় মারভিন।'

সেঁকা হয়ে গেছে মাংসটা। কৌটো থেকে লবণ আর সস বের করলো পিয়ো। তৃপ্তির সাথে খেলাম দুজন। তারপর কালো কফি।

'বেলিকে আনতে হবে' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম।

'মনে ধরেছে মেয়েটা?' হেসে বললো পিয়ো।

'ঠিক তা নয়। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে ওরা। অনেক কিছু জানে ও।'

উঠে দাঁড়ালো পিয়ো। 'অলরাইট, ক্যাপ্টেন। আমিও আছি তোমার সাথে। ভায়োলেন্স আমার কেমন পছন্দ জানো তুমি।'

'নিজেকে একটা সুযোগ দাও, পিয়ো। জেল খাটা আসামী তুমি। খুব একটা প্রয়োজন না হলে গুলি করো না। আমার হাতে ছেড়ে দাও সবকিছু। শো ডাউনের পর গভর্ণরের কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করবো আমি।'

'কেউ তোমার সুপারিশে কান দেবে না, ক্যাপ্টেন। কেউ না। পিয়োকে সবাই চেনে। সবাই জানে। পিট এবং ম্যানুয়েলের মৃত্যুতে কেমন হিংস্র হতে পারি আমি, তাও জানে।'

'ফ্লয়েড রেসি মেরেছে পিটকে—বেলি বলেছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে তুমি ওদের কাউকে খুন করলে সব দোষ চাপবে আমার ঘাড়ে। বলবে, তোমাকে ভাড়া করেছি আমি। তুমিও আত্মপ্রকাশ করে কিছু বলতে পারবে না। ফলে কেঁচে যাবে সবকিছু। একটু মাথা ঘামাও, পিয়ো। সঙ্গে থেকে আমাকে সাহায্য করো, এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আগ বাড়িয়ে গুলি করতে যেয়ো না।'

'দেখা যাবে, ক্যাপ্টেন,' পকেট থেকে তামাক বের করে মুখে পুরে বললো পিয়ো। অবাক হলাম। সেই পুরনো অভ্যাসটা এখনও রয়ে গেছে ওর।

'অ্যাপাচি স্টাইলে ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো। কলিনকে খুন করা হলে একেবারেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে সে। তারচেয়ে বেলিকে যদি বের করে আনতে পারি? কোর্টে গিয়ে যদি প্রমাণ করতে পারি, এই র‍্যাঞ্চটা ওয়েলসদের নয়? যদি প্রমাণ করতে পারি, কলিনের চক্রান্তে খুন হয়েছে পিট আর ম্যানুয়েল? কোনটা ভালো হয়?'

ভুরু কুঁচকে তাকালো পিয়ো। চিন্তা করলো অনেকক্ষণ। তারপর মাথা ঝাঁকালো।

পাহাড়ী উঁচু রাস্তা ধরে উত্তর পশ্চিমে যেতে যেতে ডোরির কথা ভাবলাম। ভায়োলেন্স পছন্দ করে মেয়েটা। ওর নাগালে যতক্ষণ থাকবে বেলি, বিপদের মধ্যে থাকবে। আরও খারাপ অবস্থা হবে জিম্বোর খপ্পরে পড়লে। জিম্বো একটা বখাটে। লম্পট। শক্তি আছে, সম্পদ আছে। আর ভালো হবার সম্ভাবনা নেই ওর।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সৎভাবে কাজ করলে সবাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়। ভয় করে। কিন্তু এখন আমরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পুলিশ আসার সম্ভাবনা শতকরা একভাগেরও কম। অপারেটর যদি কৌতূহলী হয়ে খবর দেয়, তবেই।

কিন্তু সব পুলিশ অফিসারই গুরুত্ব দেবে না ব্যাপারটায়। এড়িয়ে যাবে তুচ্ছ ঘটনা মনে করে। আর যদি সন্দেহ প্রবণ অফিসার হয়, ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোও তলিয়ে দেখার বাতিক থাকে তাদের। কলিন আর জিম্বো সম্পর্কে নিজস্ব একটা ধারণা আছে পুলিশের। এটাও আমাদের একটা ভালো সুযোগ।

হঠাৎ দেখলাম ওদের। এক হাজার ফুট নিচে, ট্রেইল থেকে প্রায় আধ মাইল দুরে, কলিনের র‍্যাঞ্চের দিকে যাচ্ছে ওরা।

পিয়োর রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে দেখলাম,

বেলিও আছে সাথে। ঘোড়ায় বসা। হাতদুটো বাঁধা পেছনে। সবার আগে একটা জীপ যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

জিমারম্যানের র‍্যাঞ্চে রাত কাটিয়েছে ওরা। এখন ফিরে যাচ্ছে নিজেদের এলাকায়। অনুমান করছি, টেলিফোন কলটা নিয়ে সারাটা রাত দুশ্চিন্তায় কেটেছে জিমারম্যানের। তাই সকালেই তড়ি ঘড়ি করে বিদায় দিচ্ছে ওদের। নিজেকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে চাইছে সে।

এখন যেখানে আছি, নিচ থেকে দেখা যাবে না। কিন্তু জানে ওরা, কোথায় থাকতে পারি আমি। আরও একজন মানুষ আছে আমার সাথে তাও জানে। খুব সম্ভব পিয়োকেই ধারণা করেছে ওরা।

দুপুরের কিছু আগে নেমে এলাম ম্যাসট্যঙ হিলের ঢালে। ট্যাঙেল ক্রীকের শুরু যেখানে। একটা জুনিপার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকালাম র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে।

দুই মাইল দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি কলিনের বাড়িটা।

গুহা থেকে বেরোনোর পর একটা কথাও বলি নি কেউ। কিন্তু বুঝতে পারছি দুজনই, ধীরে ধীরে একটা শো ডাউনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। বেলি ডসন আছে বাড়িটায়। কৌশলে বের করতে হবে ওকে। আশা করি রক্তপাত ছাড়াই পারবো। নব্বই বছর আগের আরিজোনা নয় এটা। এখন রক্তপাত হলে জবাব দিহি করতে হয়। তদন্ত হয়।

টেলিস্কোপির সাইটের ভেতর দিয়ে বার বার বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে পিয়ো। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে ও। মনে হচ্ছে, এই বুঝি টিপে দিলো ট্রিগার।

উঁচু নিচু পাথরের মাঝখান দিয়ে ঘুর পথে আরও এগোলাম খানিকটা। ওপর থেকে ছবির মতো লাগছে বাড়ি আর পুলটা। জিমা-

রম্যানের জীপটাও দেখা যাচ্ছে বাড়ির কাছে।

কজন লোক আছে ওখানে? কলিন, জিম্বো, মার্ক উইলসন আর জিমারম্যান? রেসি কোথায়?

হঠাৎ একটা লোক এসে দাঁড়ালো বাঙ্কহাউসের দরজায়। হাতে রাইফেল। চার পাশটা দেখলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর আস্তাবলের দিকে চলে গেলো ধীরে ধীরে।

'রিপ পার্কার,' ফিসফিস করে বললো পিয়ো। 'হারামীর এক-শেষ। পিটের খুনের সময় ঐ কুত্তার বাচ্চাটাও ছিলো রেসির সাথে।'

ওয়াচে রইলাম আমরা। পালা করে একজন ঘুমালাম, একজন জেগে রইলাম। কিন্তু বেলি অথবা ডোরির ছায়াও দেখা গেলো না।

দুপুরের পর মার্ক উইলসন বেরিয়ে এসে জীপে চড়লো। পাহাড়ের ট্রেইল ধরে চলে গেলো সে। এছাড়া আর কোনো সাড়া শব্দ নেই কোথাও। পুলিশের গাড়ির ছায়াও দেখছি না কোথাও। ব্যর্থ হয়েছে আমার টেলিফোন কলটা। আর সুযোগও নেই ফোনের কাছে যাওয়ার।

সন্ধ্যার কিছু আগে ড্যাড স্টাইল বেরিয়ে এলো বাঙ্কহাউস থেকে। রিপ পার্কারের স্থান দখল করলো সে।

আরও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর বললাম, 'অলরাইট, পিয়ো। চলো যাওয়া যাক।'

সাবধানে নামতে শুরু করলাম পাথরের ঢাল বেয়ে। সামনেই র‍্যাঞ্চ হাউস। জানি না, হয়তো মৃত্যু ওৎ পেতে আছে ওখানে।

দ্রুত পা বাড়ালাম বাড়িটার দিকে।

হঠাৎ অনেকদূর আলোকিত করে তিনটে সার্চলাইট জ্বলে উঠলো একসাথে। মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেলাম উজ্জ্বল আলোয়।

'ড্রপ দ্য গানস।' খসখসে গলা শোনা গেলো কলিনের।

গুলিতে শরীরটা ঝাঁঝরা হলো না দেখে কম অবাক হই নি।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকালাম চারপাশে। চারটা রাইফেল ঘিরে রেখেছে আমাদের। প্রশ্নই আসে না পালাবার। ঢালের নিচে ওরা অ্যামবুশ করে থাকতে পারে, একবারও মনে হয় নি কথাটা।

রাইফেল ফেলে হাত তুললাম ওপরে।

'যাক, তাহলে ধরা পড়লে তোমরা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো কলিন। 'বইটা ক্লোজ করতে পারি এবার।'

'মৌচাকে খোঁচা দিয়েছেন আপনি, মিস্টার কলিন। আমার পাবলিশার ভীষণ নার্ভাস মানুষ। আমার অন্তর্ধানের খবর শুনলে দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে শুরু করবে সে। ঘুম হারাম করে দেবে গভর্ণর, শেরিফ আর অ্যাটর্নি জেনারেলের।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ করলো জিম্বো। 'তুমি কি এতই ইমপরটেন্ট?'

'পাবলিশারের অনেক টাকা অগ্রিম নিয়েছি আমি। সেটাই ইমপরটেন্ট। তার নিজের গরজেই উঠে পড়ে লাগবে সে।'

ঘেরাও অবস্থায় এগোলাম বাড়ির দিকে। পিয়ো আমার সামনে। আশা ছাড়ি নি এখনও। নাটক নভেলে নায়িকা যেমন দস্যুর হাত থেকে পালিয়ে যায়, তেমন অলৌকিক কিছু একটা আশা করছি। যদিও কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি আমরা।

'কলিন,' ফিসফিস করে বলতে শুনলাম জিমারম্যানকে। 'মারাত্মক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা। আফটার অল হি ইজ এ প্রেটি ওয়েল-নোন ম্যান!'

'তা জানি,' গলা খাটো করে বললো কলিন। 'কিন্তু এতবড় সম্পত্তিটা হাত ছাড়া করি কিভাবে?

আলো জ্বলছে বসার ঘরে। ডোরি একা বসা। হাতে ড্রিংকস

আমাকে দেখে চোখ তুললো গ্লাস থেকে। হেসে বললো, 'আসতেই হলো আবার। মাঝখানে এতগুলো লোককে ভুগিয়ে মারলে।

'তোমার জন্যই আসতে হলো। সেই বিকিনি পরা দেহটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

খিলখিল করে হেসে উঠলো ডোরি। কিন্তু দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা। মেয়েটাকে খাপ খাওয়াতে পারছি না এদের সাথে। আরও একজন আছে। জিমারম্যান। লোকটা ভীতু। ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চায়। ভাবলাম, যদি কোনো সুযোগ আসে, এদের দুজনের কাছে থেকেই আশা করা যায়। আর কেউ না। আমার খুনের পরিণামটা কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, সেই ভীতিটা সংক্রামক রোগের মতো প্রবেশ করাতে হবে ওদের মধ্যে।

'একটা ড্রিংকস দরকার আমার।' বলতে বলতে ওয়াল কেবিনেটের দিকে এগোলো জিমারম্যান।

রাগত ভাবে ওর দিকে তাকালো মার্ক উইলসন। তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো কলিনের সাথে।

'খাবার কদ্দুর।' ডোরির দিকে তাকালো কলিন। 'ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।'

'দেরি নেই।' আমার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললো ডোরি। 'রাইটারকে তো পেয়ে গেলে, কি করবে এখন?'

কাউকেই বলে দিতে হবে না, কি হবে এখন। জানে সবাই। কিন্তু মুখ ফুটে বলছে না কেউ।

পিয়ো ধরলো কথাটা। নিঃশব্দে হাসলো দাঁত বের করে।

'ভিয়েতনামের কথাটা মনে আছে, ক্যাপ্টেন? লক্ষণটা তেমনই মনে হচ্ছে।'

চোখ দুটো ছোট হয়ে গেলো জিমারম্যানের। ভুরু কুঁচকে তাকালো আমার দিকে। 'ভিয়েতনাম? কি বলছে ও?'

'ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধ করেছি আমরা। একসাথে ধরা পড়েছি, আবার মুক্তও হয়েছি একসাথে।'

'ঐ জংলীটা সৈনিক ছিলো?' অবাক হলো জিম্বো।

'হ্যাঁ। এ ফার্স্ট-ক্লাস ফাইটিং ম্যান। পালাবার সময় এক ডজন গার্ড খতম করে ও।'

পিয়োর দিকে ফিরে গেলো সবার দৃষ্টি। কিন্তু কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করলো না কেউ।

হাতের গ্লাসটা নাড়াচাড়া করছে জিমারম্যান। মুখের ভাব দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, সত্যি ভয় পাচ্ছে লোকটা।

মার্ক উইলসন বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। বাইরে কারো সাথে কথা বলছে নিচু গলায়। নিশ্চয় গার্ডের ব্যবস্থা করছে সে।

এই মুহূর্তে কেন মেরে ফেলছে না আমাদের? এমন কে আছে এখানে যাকে ভয় করছে ওরা? অথবা নতুন করে ভাবছে কিছু?

এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ডোরি। কি যেন ভাবছে মেয়েটা।

'পুরুষ মানুষের জেল হলে তেমন সাড়া জাগায় না খবরটা,' হঠাৎ বললাম আমি। 'কিন্তু মেয়েদের বেলায় সেটা হয় দারুণ খবর। আর সে মেয়ে যদি টপ সোসাইটির সুন্দরী মেয়ে হয়, তবে তো কথাই নেই।'

আড় চোখে তাকালাম ডোরির দিকে। ওর চোখের পাতাদুটো কাঁপলো একটু।

'আজ রাতে কি ঘটবে এখানে সেটাই বড় কথা নয়,' একমিনিট ডোরির প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করে শুরু করলাম আবার। 'ভাবছি এরপর

কি হবে। একমাসও লাগবে না তদন্ত শেষ করতে। অনেকে অনেক-কিছু হারাবে। বন্ধ হয়ে যাবে অনেক ঘরের দরজা।' কলিনের দিকে তাকালাম। 'প্রথম থেকেই ভুল করে আসছেন আপনারা। প্ল্যানটা নিখুঁত ছিলো না। ভেবেছিলেন শহুরে মানুষ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে আশ্চর্য হবে না কেউ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, মিস্টার কলিন। যারা আমাকে চেনে, যাদের সাথে পরিচয় আছে আমার, তারা সবাই জানে, ঘোড়া চালানোয় আমিও পারদর্শী কম নই। তাড়া-হুড়োর মধ্যে করেছেন প্ল্যানটা, তলিয়ে দেখেন নি ভালোভাবে। এজন্য খুঁত রয়ে গেছে ওটায়। ভেবেছিলেন আমাকে গুম করে দিলেই শেষ হয়ে যাবে ব্যাপারটা, চুকে যাবে সবকিছু। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি যেখানে শেষ ভেবে রেখেছেন, ওখান থেকেই হবে শুরু। আরও একটা কথা মিস্টার কলিন, সার্জেন্ট রেলি জানে আমি কোথায় আছি। হয়তো এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে সে।'

'থামো।' ধমকে উঠলো কলিন। 'বেশি কথা বলছো তুমি।'

চুপ করে গেলাম। থমথমে নীরবতা নেমে এলো ঘরের ভেতর। আরও অন্যমনস্ক লাগছে ডোরিকে। আরাম-আয়েশ আর নিজের রূপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন মেয়েটা। কিন্তু এখনও জানে না, একটা তলা ফাটা জাহাজে বসে আছে ও। কানায় কানায় ভরে গেছে পানিতে। ও নিজেও ডুববে কলিনের সাথে। বোঝাতে হবে ওকে। বিশ্বাস করাতে হবে একটাই পথ আছে বাঁচার, পিয়ো আর আমাকে মুক্ত করে দিলে।

আরও একটা ড্রিংকস নিলো জিমারম্যান।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ঘরের ভেতর মাথা গলালো মার্ক উইলসন। 'খাবার রেডি।' বলেই আবার টেনে দিলো। জিম্বো উঠে

এগোলো সেদিকে।

'জিম্বো?' পেছন থেকে ডাকলো কলিন।

ঘুরে তাকালো জিম্বো।

'বলো।'

'দুটো দড়ি নিয়ে এসো শক্ত দেখে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো জিম্বো।

চট করে তাকালাম পিয়োর দিকে। একটা ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতে পেলাম অ্যাপাচিটার ইস্পাত কঠিন চেহারায়। দাঁতে দাঁত চেপে কলিনকে দেখছে ও।

মিনিট দুয়েক পর দড়ি নিয়ে ফিরে এলো জিম্বো। এক হাতে পিস্তল। পিস্তলটা কলিনের হাতে দিয়ে কাজে লেগে গেলো দ্রুত। বেঁধে ফেললো পিঠমোড়া করে। প্রথমে পিয়োর। তারপর আমার।

কাজ শেষ হলে বেরিয়ে গেলো জিম্বো, কলিন আর ডোরি। জিমারম্যান নড়লো না জায়গা থেকে। গ্লাস হাতে বসে রইলো সে।

'তুমি কেন বিপদ ডেকে আনছো, জিমারম্যান?' বললাম আমি। 'কি স্বার্থ আছে তোমার?'

কথা বললো না জিমারম্যান। এমন কি মুখ তুলেও তাকালো না।

একটু বিরতি নিয়ে আবার বললাম, 'পুলিশি ঝামেলা হবে। তোমার হাতেও হাতকড়া পড়বে। এখনও সময় আছে। ভেবে ছাখো। ইচ্ছা করলে আমাদের বাঁধনটা খুলে দিতে পারো। তোমার পক্ষে কথা বলবো আমি।'

এবার মুখ তুলে তাকালো জিমারম্যান।

'পাগল হয়েছো?'

'আমার পাবলিশার এখন ডেনভারে। আরিজোনার গভর্ণরের আত্মীয় সে। আমার সেক্রেটারির কাছে অন্তর্ধানের খবর পেলে লঙ্কা-কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। তল্লাশী শুরু হয়ে যাবে দেশের প্রতিটা জায়গায়।'

ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে আছে জিমারম্যান। ঘামছে।

একটু সরে সোফার প্রান্তে গিয়ে বসলো পিয়ো। দৃষ্টিটা টেবিলের ওপর। তাকিয়ে দেখলাম, লাইটারটা দেখছে ও।

'এ গোলমাল থেকে তুমি বেরিয়ে যেতে পারো, জিমারম্যান,' আবার বললাম। 'বাঁধনটা খুলে দাও। তোমার জীপটা নিয়ে চলে যাবো।'

'অসম্ভব। গার্ড আছে গেটে।'

'সেটা আমরা বুঝবো', পিয়ো বললো, 'তুমি শুধু বাঁধনটা খুলে দাও।'

ক্যাঁচক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হলো। কলিনের মাথাটা দেখা গেলো শুধু। 'তুমি কিছু খাবে না, জিমারম্যান?' বললো সে। 'সারারাত জেগে থাকতে হবে কিন্তু।'

'আমরা কি উপোস থাকবো?' পিয়ো বললো।

কথাটা গ্রাহ্য করলো না কলিন। সশব্দে বন্ধ করে দিলো দরজাটা।

'কিছু করলে জলদি করো, জিমারম্যান! ওরা এসে পড়বে আবার।'

উঠে দাঁড়ালো জিমারম্যান। কিছু বলতে চাইলো। খানিক ইতস্ততঃ করলো। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেলো।

এতক্ষণ যা বললাম ওদের, তার পুরোটা সত্য না হলেও আংশিক সত্য। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। আমার সেক্রেটারি, পাবলিশার আর অগণিত পাঠক পাঠিকা, সবাই উঠে পড়ে নামবে আমার জন্য। কিন্তু সেটা পরের ব্যাপার। ততদিনে শেয়াল কুকুরের পেটে চলে যাবে আমার লাশ।

দশ

বসে আছি আমি আর পিয়ো। দুজনের হাত দুটোই বাঁধা পেছনে। হঠাৎ খুলে গেলো দরজাটা। আবার ঘরে ঢুকলো জিম্বো। এক হাতে বীয়ারের গ্লাস। অন্য হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ। যেভাবে তাকালো আমার দিকে, বুঝতে পারলাম কেন এসেছে ও। স্যাণ্ডউইচটা মুখে পুরে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর। সাবধানে পিয়োকে দেখলো একবার। তারপর এগোলো আমার দিকে।

সশব্দে গালের ওপর এসে পড়লো জিম্বোর ভারী হাতের পাঞ্জাটা। পানি এলো চোখ ফেটে। একটা কথাও বললাম না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম শুধু ওর মুখের দিকে। আমার নীরবতা আরও ক্রুদ্ধ করলো জিম্বোকে।

ঘুসি মারার ভঙ্গীতে আবার হাত তুললো ও। হঠাৎ সোফা থেকে গড়িয়ে পড়লো পিয়ো ওর পেছনে। ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিলাম এক পাশে। বাতাস কেটে গেলো ঘুসিটা। এক সেকেণ্ডের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো জিম্বো। ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালাম বিদ্যুৎ বেগে। মাথা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গুতা মারলাম ওর পেট বরাবর। পেছনে পিয়োর শরীরে বাধা পেয়ে চিৎ হয়ে পড়লো জিম্বো।

মাথার পেছন দিকটা জোরে ঠুকে গেলো ফ্লোরে। সাথে সাথে ওর দুপায়ের ওপর চেপে বসলো পিয়ো। আমি গিয়ে পড়লাম বুকের ওপর। হাঁটু দিয়ে ঠেসে ধরলাম গলা। বাতাসের জন্য ছটফট করতে লাগলো জিম্বো। প্রাণপণ চেষ্টা করছে আমাকে বুকের ওপর থেকে সরাতে।

পেছনের দরজাটা খুলে গেলো এমন সময়। 'জিম্বো···

ঘরে ঢুকলো কলিন। চুল ধরে টেনে ফেলে দিলো আমাকে। ভার মুক্ত হয়ে উঠতে গেলো জিম্বো। সাথে সাথে পায়ের ওপর থেকে সরে এসে ওর গলায় দাঁত বসিয়ে দিলো পিয়ো।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো জিম্বো। পরক্ষণেই শূন্যে উঠে গেলো পিয়োর শরীরটা। সশব্দে আছড়ে পড়লো ফ্লোরে।

উঠে দাঁড়ালো জিম্বো। সরু একটা রক্তের ধারা নেমে আসছে গলা বেয়ে। আহত চিতার মতো তাকালো আমার দিকে। একটা পা উঠে গেলো মাথা লক্ষ্য করে। দু হাঁটুতে ভর করে বসেছিলাম। মাথাটা সরিয়ে নিলাম পেছনে। ফসকে গেলো লাথিটা।

'থামো! গর্দভ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠে দ্রুত দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো কলিন।

প্রচণ্ড ধাক্কায় কলিনকে সরিয়ে দিলো জিম্বো। আবার তেড়ে এলো বুনো মোষের মতো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝন ঝন করে বেজে উঠলো ফোনটা।

চমকে উঠে তাকালাম ফোনটার দিকে।

জিম্বোও থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওদিকে। মুহূর্তে পরিবেশটা পাল্টে গেলো ঘরের।

পা বাড়ালো কলিন টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে। হঠাৎ দৌড়ে

ঘরে ঢুকলো ডোরি। 'আমাকে বলতে দাও।' ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে কানে লাগালো ও।

'ডোরি?' কাঁপা একটা মেয়েলী গলা ভেসে এলো ওপাশ থেকে। 'কোথায় ছিলে তোমরা, ডোরি? সারাটা দুপুর চেষ্টা করেও পাই নি কাউকে। মার্থা এসেছে আমার এখানে। পুলে আসছি আমরা।'

'আজ নয়। আজ বিশেষ একটা·····

'পুলিশ পাঠাও।' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। 'জলদি খবর দাও টম রে—'

শেষ করতে পারলাম না কথাটা। দুই হাতে আমার গলা টিপে ধরলো কলিন।

সশব্দে রিসিভারটা রেখে দিলো ডোরি। 'খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, রাইটার।'

আমার গলা ছেড়ে দিয়ে মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেলো কলিন। 'ডোরি, উত্তেজিতভাবে বললো সে। 'জলদি কয়েকটা গ্লাস আনো। আধা আধি করে হুইস্কি ঢালো সবকটায়। কিছু সিগারেটের গোড়া টোকাও···বড় কয়েকটা অ্যাশট্রে আনো। কিছুক্ষণ আগে একটা পার্টি হয়েছে এখানে তেমন একটা পরিবেশ তৈরি করো। তারপর বেলিকে নিয়ে এসো। এক্ষুণি মীমাংসা করে ফেলবো ব্যাপারটা।'

পিয়োকে যেখানে ছুঁড়ে ফেলেছিলো জিম্বো, সেখানেই পড়ে আছে ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি যেন বলতে চাইছে।

ব্যস্ত হয়ে পড়লো ডোরি। পাঁচ মিনিটও লাগলো না সবকিছু ঠিকঠাক করতে। তারপর বেরিয়ে গেলো বেলিকে আনতে। প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এলো। আঘাতের চিহ্ন বেলির মুখে। রক্ত জমে

আছে কয়েক জায়গায়।

আমাকে দেখে নিঃশব্দে হাসলো বেলি।

সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলো কলিন। 'বেলি, তোমাদের র‍্যাঞ্চটা কিনতে যাচ্ছি আমি।' এক শীট সাদা কাগজ বের করে বেলির সামনে রাখলো সে। আঙুল দিয়ে টোকা দিলো দুটো। 'সই করো এখানে।'

'পারবো না,' মুখ ঝামটা মারলো বেলি।

'তোমার পছন্দ অপছন্দে কিছু আসে যায় না আমার। অনেকদিন অপেক্ষা করছি আর নয়। সই করো জলদি।'

'খবরদার বেলি, সই করো না,'। বললাম আমি। 'ওরা সবাই প্রতারক।'

কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো কলিন। 'ওসব বুলি আওড়ে লাভ নেই, রাইটার।' তারপর ফিরলো বেলির দিকে। 'সই করো। তবেই যেতে পারবে এখান থেকে।'

ডোরির দিকে তাকালাম। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ডোরি। বেলির দিকে খেয়াল নেই ওর। তাকিয়ে আছে আমার দিকে কি ভাবছে জানি। নিশ্চয়ই টেলিফোনটার কথা ভাবছে ও। আমার গলা অবশ্যই শোনা গেছে অপর প্রান্তে। হয়তো পুলিশের কানেও এতক্ষণে পৌঁছে গেছে কথাটা।

দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে ডোরিকে। বুঝতে পারছি, এই বিশাল সম্পত্তির একটা কণাও না হারিয়ে কিভাবে এর সন্তোষজনক সমাধান করা যায়, তাই ভাবছে ও।

টেবিলটা ঘুরে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো ডোরি। গা ঘেঁষে যাবার সময় আড়ালে কি যেন গুঁজে দিলো আমার হাতে। না দেখেই

বুঝলাম, ছোট্ট একটা নখ কাটার ছুরি।

'কলিন,' বললো ডোরি। 'যে কোনো মুহূর্তে লিণ্ডা এসে যেতে পারে। বাইরে নিয়ে যাও ওদের। লিণ্ডা না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে রাখো কোথাও।'

ডোরির দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত ভাবলো কলিন। তারপর বললো, 'গুড আইডিয়া। পুরোনো দুর্গটায় নিয়ে যাই ওদের। ওখানেই সই করবে বেলি।'

ভারী কাঠের দরজা খুলে দুর্গের ভেতর ঢোকানো হলো আমাদের। 'ভেবে দেখো, বেলি,' বললো কলিন। 'লিণ্ডা চলে যাবার পর আবার আসবো আমি।' যাবার আগে বেলির হাত দুটোও বেঁধে দিয়ে গেলো ওরা।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কাগজটায় সই দিলে কি হবে আর না দিলে কি হবে, বুঝতে পারছি না কিছুই।

অনেকদিন আগে আমি আর পিয়ো বন্দী হয়েছিলাম ভিয়েতনামে। প্রতিটা মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম মৃত্যুর। ঠিক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো আজ।

যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছে ডোরি। একটা ছুরি দিয়েছে আমাকে। নিজের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। কলিনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হবে সবাইকে। তখন বাঁচার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে ডোরি। বলতে পারবে, স্বামীর বিপক্ষে যাবার সাহস ছিলো না ওর। কিন্তু গোপনে আমাকে সাহায্য করেছে পালাতে।

পিয়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'একটা ছুরি আছে আমার কাছে। কাজে লেগে যাও তুমি। অন্য একটা প্ল্যান ঢুকছে আমার মাথায়।'

ভেতরটা অন্ধকার। অনেকদিন বন্ধ থাকার ফলে ভেপসা একটা গন্ধ আসছে নাকে।

'বেলি,' গলা খাটো করে বললাম, 'আগে এসেছো কখনও? কি রাখা হয় এখানে?'

'ভাঙা জিন, লাগাম, হোলস্টার···দড়িকাছি ইত্যাদি।'

বাইরে তালা আছে জানি। ওরা যাবার সময় তালা মারার শব্দ শুনেছি দরজায়। হাতের বাঁধন খুলতে পারলেও বেরোবার উপায় নেই। ঘরটার দেয়ালটাও পাথরের।

একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। টেলিফোনের ব্যাপারটায় ঘাবড়ে গেছে ওরা। যা কিছু করার খুব তাড়াতাড়ি করবে। এবং আমাদেরও তাই করা উচিত।

দু'মিনিটেই নিজের হাতের বাঁধনটা কেটে ফেললো পিয়ো। তারপর আমার আর বেলিরটা।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম দূরে। আস্তে আস্তে র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনায় এসে থামলো শব্দটা। দুর্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করে গেলো হেডলাইটের আলো। ছিদ্র দিয়ে ভেতরে আসা আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখলাম আশেপাশের জিনিস-পত্রগুলো। ভাঙাচোরা জিন লাগামের বড় একটা কাঠের বাক্সও আছে এক কোণে। ডালা নেই। মরচে ধরা নাট-বল্টু, কব্জা ইত্যাদিতে বোঝাই।

'ক্যাপ্টেন', হঠাৎ বললো পিয়ো, 'ছাদের দিকটা চেষ্টা করে দেখি।'

ছাদ? মনে করার চেষ্টা করলাম ডায়েরির লেখাগুলো। ছাদ সম্পর্কে কিছু লেখা ছিলো কি? মনে পড়ছে না।

বেলি, ছাদটা কিসের তৈরি, জানো ? পাথর কাঠ বা অন্যকিছু ?'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো বেলি, 'দুঃখিত, বলতে পারছি না। অনেকবার এসেছি এদিকে। কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'আমাকে একটু তুলে ধরো, ক্যাপ্টেন।'

অন্ধকারে পিয়োর শরীরটা হাতড়ে বসে পড়লাম ওর পায়ের কাছে। দাঁড়াতে বললাম হাতের তালুর ওপর। পা দিয়ে হাতের সঠিক অবস্থানটা বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিয়ো। কোমর পর্যন্ত উঁচু করে ধরতেই নাগাল পেলো ছাদটা।

'কাঠের,' বললো পিয়ো। 'চেরাই কাঠের।' আঙুলের ডগা দিয়ে ছাদটা ঘষা দিলো ও। ঝুরঝুর করে কিছু ধুলোবালি ঝরে পড়লো আমার মাথায় আর কাঁধে।

লাফ দিয়ে নেমে পড়লো পিয়ো। 'কি করবে এখন, ক্যাপ্টেন ?'

'পুরোনো কাঠ। বৃষ্টির পানিতে পচে গিয়ে থাকতে পারে। কোনো রকমে একটা আলগা করতে পারলেই হবে।'

'শব্দ হবে। গার্ড আছে বাইরে।'

'তা ঠিক। কিন্তু এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।'

'লাইক ইন ভিয়েতনাম, ক্যাপ্টেন ?'

'হ্যাঁ। এসো এদিকে। আমার কাঁধে চড়ো। যেখানে নরম মনে হবে, জোরে চাপ দেবে কাঁধ দিয়ে।'

কপাল খারাপ আমাদের। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ছাদটা পরীক্ষা করলো পিয়ো। কিন্তু চার আঙুল পরিমাণ পচা কাঠ ঠেকলো না হাতে।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো বাইরে। কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো পিয়ো। 'হোয়াটস দ্যাট ?' হিসহিস করে উঠলো ও।

একটা ছিদ্রে চোখ রাখলো বেলি। 'সুইমিং পুলের আলো। লিণ্ডা

নামছে পানিতে।' আরও কিছুক্ষণ দেখে বললো, 'কাউন্টি কমিশনারের বোন মার্থাকেও দেখছি সাথে। সারা আরিজোনায় এই একজন মাত্র মহিলাই আছে, যাকে উপেক্ষা করা যায় না সহজে। অল্প বয়সেই নাম করে ফেলেছেন রাজনীতিতে।'

হঠাৎ বুটের শব্দ শোনা গেলো বাইরে। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। দরজা পর্যন্ত এলো শব্দটা। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে। আবার মনোযোগ দিলাম ছাদের দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট গলদঘর্ম হবার পর মরচে ধরা ক্ষয়ে যাওয়া একটা পেরেক বের করে আনলো পিয়ো।

আবার একটা হাঁটা-চলার শব্দ হলো দরজার কাছে। নিঃশব্দে কাঁধ থেকে নেমে পড়লো পিয়ো। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'কাজ হতে পারে, ক্যাপ্টেন। আরেকবার চেষ্টা করতে হবে।'

দরজার কাছে কিছুক্ষণ পায়চারি করলো কেউ। তারপর চলে গেলো।

'এখনই?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'হ্যাঁ।'

আবার কাঁধে চড়ে বসলো পিয়ো। পেরেকটা খুলেছিলো যেখানটায়, কাঁধ দিয়ে জোরে চাপ দিলো সেখানে। চড়চড় করে শব্দ হলো একটু। পরক্ষণেই একটা তক্তা উঠে গেলো ওপরে। তারা দেখা গেলো রাতের আকাশে। ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস ঝাপটা মারলো চোখে-মুখে।

একটু কসরত করতেই ফাঁকটা গলে ছাদে উঠে গেলো পিয়ো। প্রায় সাথেসাথে মুখটা বের করে নিচের দিকে ঝুঁকে বলল, 'মেয়েটাকে উঁচু করে ধরো, ক্যাপ্টেন।'

'তুমি কিভাবে উঠবে?' জানতে চাইলো বেলি।

'আগে তুমি ওঠো। আমার জন্য ভেবো না।'

কোমর ধরে উঁচু করলাম বেলিকে। ওপর থেকে শক্ত দুটো হাত চোখের পলকে টেনে নিয়ে গেলো ওকে।

ভাবলাম মনে মনে, যতক্ষণ পর্যন্ত লিণ্ডা আর মার্থা আছে সুইমিং পুলে, এ ঘরে ঢুকবে না কেউ। এরমধ্যে পিয়ো শহরে পৌঁছতে পারে, টম রেলি নিশ্চয় ছুটে আসবে আমার জন্য।

আবার বুটের শব্দ শোনা গেলো দরজার কাছে।

'খবরদার! কথা বলবে না কেউ ভেতরে।' চাপা গলায় সাবধান করে দিলো কেউ। পিটিয়ে তক্তা বানাবো সবকটাকে।'

হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তির শব্দ হলো বাইরে। বন্য শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করছে কেউ। দ্রুত কয়েকবার পা আছড়ালো মাটিতে। তারপর সব চুপচাপ।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো পিয়ো। 'ভিয়েতনামে ঠিক যেমনটা ঘটেছিলো, ক্যাপ্টেন। গার্ডের পকেটেই ছিলো চাবিটা।'

ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এলাম অজ্ঞান লোকটাকে। সত্যি অজ্ঞান কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। পিয়োকে চিনি আমি।

'ধরো।' একটা রাইফেল আর গুলির বেল্ট দিলো পিয়ো আমার হাতে।

বাইরে এসে তালা লাগালাম দরজায়। ডানে বাঁয়ে দেখে বললাম, 'বেলি কোথায়?'

মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো পিয়ো। 'ভীষণ ভয় পেয়েছে মেয়েটা। ওদিকে গেছে।' আঙুল তুলে সুইমিং পুলের দিকে দেখালো ও।

'কি ?'

'পুরো ঘটনাটা বলতে যাচ্ছে লিণ্ডা আর মার্থার কাছে। শহরে চলে যাবে ও।'

'ওকে যেতে দেবে না কলিন। বলবে হিস্টিরিয়ায় ভুগছে।'

অবাক হয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে পুলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে স্লিম ফিগারের মেয়েটা। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম ওকে।

কলিন আর ডোরি বসা পুলের কাছে। বেলিকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ওরা।

'লিণ্ডা, একটা লিফট দেবে আমাকে ?' অনুরোধের সুর বেলির গলায়।

'সবেমাত্র নেমেছি পানিতে, বললো লিণ্ডা। পুরো শরীরটা ভিজে নি এখনও।

'এক্ষুণি যেতে চাই আমি।'

'পাগলামী করো না বেলি,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো কলিন। 'সাঁতরাতে দাও ওদের। এখানেই তোমার ভালো চিকিৎসা হবে। হাসপাতালে যাবার দরকার নেই।'

সিঁড়ি বেয়ে পাড়ে উঠে এলো ওরা। 'কি হয়েছে ওর ?' জানতে চাইলো মার্থা।

'স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে,' সহজভাবে বললো কলিন। 'ওর বোনের মৃত্যুর পর কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ও।'

'মিথ্যে কথা।' চিৎকার করে উঠলো বেলি। 'স্বাভাবিকভাবে মরে নি আমার বোন। খুন করা হয়েছে তাকে। যেমন আমাকে আর শেরিডানকে খুন করার প্রচেষ্টা চলছে এখন।'

'ড্যান শেরিডান ? লেখক ?' অবাক হলো মার্থা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো কলিন। ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে সে। বুকের ভেতর বন্য একটা আক্রোশ ফুঁসে উঠলেও লিণ্ডা আর আর মার্থার সামনে নিরুপায় এখন। নরমভাবে বললো, 'ঠিক আছে, লিণ্ডা। নিয়ে যাও ওকে। একটু খেয়াল রেখো, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

ভুরু কুঁচকে কলিনের মুখের দিকে তাকালো বেলি। আমিও কম অবাক হই নি শুনে! 'কখনও তা চাও না তুমি, কলিন,' বললো ও।

'অবশ্যই চাই।' লিণ্ডার দিকে ফিরলো কলিন। 'লিণ্ডা, ওকে একটা লিফট দিলে খুব খুশী হবো। বিকেলে একটা পার্টি দিয়েছিলাম এখানে। মেহমানদের মধ্যে একটু বেশি বেসামাল হয়ে পড়েছিলো কেউ কেউ। হৈ হল্লা হয় প্রচুর। তখন থেকেই মানসিক অসুখটা বেড়ে গেছে ওর।'

'মিথ্যে কথা।' আবার চিৎকার করে উঠলো বেলি। 'মিথ্যে কথা বলছে ও।'

'এবং বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।' বেলির কথায় কান না দিয়ে আবার শুরু করলো কলিন। 'মনে করে, আমরা সবাই খুন করতে চাইছি ওকে। অ্যাক্সিডেন্টে ওর বোন একাই মরে নি, আমার ছোটো ভাই অকিও মারা যায় সেই সাথে। তোমার মনে আছে হয়তো। নিয়ে যাও ওকে লিণ্ডা। নয়তো একটু পরেই মত পাল্টে ফেলবে। স্থিরভাবে কিছু ভাবতে পারছে না এখন।'

'পাগল হয়ে গেলো নাকি লোকটা?' কানের কাছে ফিসফিস করে উঠলো পিয়ো। 'বেলিকে শহরে যেতে দিলে সবকিছু ফাঁস করে দেবে-না ও?'

'এ লোকা নয় কলিন,' পুল থেকে চোখ না সরিয়েই বললাম। 'ধড়িবাজ লোক। অন্য মতলব ওর।'

'অবশ্যই নেবো' বললো লিণ্ডা। 'একমিনিট। কাপড়টা পাল্টে

আসছি।'

ওরা ড্রেসিংরুমের দিকে চলে গেলে শান্ত ভাবে বললো বেলি, 'এতে কি লাভ আশা করছো তুমি? কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।' বাড়ির ভেতর ঢোকার জন্য ঘুরে পা বাড়ালো বেলি। পেছন থেকে বললো কলিন, 'আর কেউ না করলেও ওরা যে করেছে তা তো বুঝতেই পারছো। ভয় নেই। যাও ওদের সাথে।'

চুপচাপ এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিলো জিম্বো। 'কলিন,' বললো সে, 'যেতে দিয়ো না ওকে।'

নিঃশব্দে হাসলো কলিন। হাসিটা ভালো লাগলো না আমার। 'কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত, তোমার কাছে শিখতে হবে না।' ঘুরে তাকালো সে। 'উইলসন?'

একটু দূরে দাঁড়ানো ছিলো মার্ক উইলসন। কাছে এলো ডাক শুনে।

'ওল্ড ফায়ার রোডটা চেনো?'

'শিওর, বস্।'

'বিশপ ক্রীকের কাছে হাইওয়ের সাথে মিশেছে ওটা, তাই না?'

'ইয়েস, বস্।'

'এক্ষুণি চলে যাও জিমারম্যানের জীপটা নিয়ে। বাতি বন্ধ করে অপেক্ষা করবে তেমাথার কাছে।'

নিচু স্বরে আরও কিছুক্ষণ কথা বললো ওরা। একটা কথাও ঢুকলো না আমাদের কানে। সমজদারের ভঙ্গিতে বারবার শুধু মাথা ঝাঁকাতে দেখলাম মার্ক উইলসনকে।

সরে এলাম পুলের কাছ থেকে। 'তুমি চেনো রাস্তাটা?' জিজ্ঞেস করলাম পিয়োকে।

'চিনি।'

বুঝতে পারছি না, কি আছে কলিনের মনে, কেন যেতে দিচ্ছে বেলিকে।

'রাস্তাটা র‍্যাঞ্চের বাইরে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কি আছে ওখানে?'

'কিছুই না। ভীষণ খারাপ রাস্তা। ঘোড়ায় চড়ে যেতেও কষ্ট হয়।'

অপেক্ষা করতে লাগলাম দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি বাড়িটার দিকে। ভেতরে ঢুকলো জিম্বো আর মার্ক উইলসন। একটা জীপ স্টার্ট নেবার শব্দ হলো একটু পর। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো শব্দটা।

লিণ্ডার মার্সিডিজ বেঞ্জে চড়ে বসলো বেলি আর মার্থা। কলিন হাত নেড়ে বিদায় জানালো ওদের।

'ক্যাপ্টেন, আর থাকা উচিত নয় এখানে। এক্ষুণি দুর্গে ঢুকবে ওরা।'

দুর্গের পথ থেকে সরে দাঁড়ালাম দূরে। 'ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার কাছে, পিয়ো। গলদ আছে। বেলিকে যেতে দিয়ে এমন ভুল করবে না কলিন। বোকা নয় সে।'

'কিন্তু দেখলে তো, তোমার সামনেই চলে গেলো।'

হঠাৎ দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেলো মনটা। 'কি আছে ওখানে, পিয়ো? হাইওয়ের সাথে যেখানে মিশেছে রাস্তাটা?'

'পাহাড় থেকে নেমে এসেছে রাস্তাটা। একটা বাঁক নিয়ে মিশেছে হাইওয়ের সাথে। রাতের বেলায় আমি কক্ষণো যাবো না ওদিকে।'

'মনে করো হাইওয়ে ধরে ষাট মাইল স্পীডে যাচ্ছো তুমি। ফায়ার রোড থেকে আচমকা ছুটে এলো একটা জীপ। ধাক্কা মারতে যাচ্ছে

তোমাকে তেরছাভাবে। কি করবে তখন? পারবে কাটাতে?'

'অসম্ভব। রাস্তাটা সরু। কাটাতে গেলেই উড়ে গিয়ে খাদে পড়বে গাড়ি। যদি কড়া ব্রেক আর ভালো কপাল হয়, হয়তো সবেগে একটা গুতো মেরে থেমে দাঁড়াবে। কিন্তু বাজি ধরতে পারবো না কথাটায়।'

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেলো সবকিছু। তাহলে এই প্ল্যান করেছে কলিন। তিনজনকে একসাথে মারতে পারলে বেলির ব্যাপারে সংশয় থাকবে না কারও মনে। নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে করবে সবাই।

হঠাৎ একরাশ শূন্যতা ঘিরে ধরলো আমাকে। ফাঁকা হয়ে গেলো ভেতরটা। আমার চোখের সামনে দিয়ে মৃত্যুর দিকে চলে গেলো বেলি। দাঁড়িয়ে দেখলাম শুধু। ফেরাতে পারলাম না ওকে।

এগারো

অন্ধকারে পা বাড়ালো পিয়ো। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম ওকে। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখলাম গাড়ির আলোটা। বেশ দূরে। দক্ষিণে যাচ্ছে জীপটা।

'দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে কেন ওরা, পিয়ো?'

'পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটা। আসার সময়ও দেখেছো? মনে নেই?'

পেছন থেকে থাবা মেরে কাঁধ চেপে ধরলাম ওর। 'পিয়ো, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাবার পথ আছে? সোজা পথ! ওদের আগে পৌঁছতে চাই হাইওয়েতে।'

'ঘোড়া!' দৌড়ুতে শুরু করলো পিয়ো। থামলো আস্তাবলের কাছে এসে। পাশে আরও একটা শেড। জিনের স্টোর। প্রায় একশো গজ দূরে একটা লগ কেবিন! আলো জ্বলছে ভেতরে।

'কে থাকে ওখানে, পিয়ো?'

'ড্যাড স্টাইল।'

রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো পিয়ো শেড-টায়। প্রায় সাথে সাথে ফিরে এলো দুটো জিন নিয়ে। তারপর ঢুকলো আস্তাবলে।

নড়ে চড়ে দাঁড়ালো ঘোড়াগুলো। পাথরে খটখট শব্দ হলো ক্ষুরের। রাতের বেলা লণ্ঠন ছাড়া আগন্তুক দেখে ভয় পেয়েছে ওগুলো।

হঠাৎ লাইটটা নিভে গেলো কেবিনের। খুট করে খুলে গেলো দরজা। হাতে একটা ইলেকট্রিক লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলো ড্যাড স্টাইল। হাঁক ছাড়লো আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে। 'কে ওখানে?'

'কেবিনে ফিরে যাও, স্টাইল। তোমাকে মারার ইচ্ছা নেই আমার।'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়ালো স্টাইল। লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুলে ধরে দেখতে চেষ্টা করলো আমাকে।

'আচ্ছা, তাহলে তুমি! ফুলিশ রাইটার!' লণ্ঠনটা ছুড়ে মারলো সে আমার দিকে। সাথে সাথে পিস্তল বের করলো ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে। কিন্তু এক সেকেণ্ড দেরি করে ফেললো ও। গর্জে উঠলো আমার রাইফেলটা। বুকে হাত চেপে বাঁকা হয়ে গেলো স্টাইলের দেহটা। হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গেলো বাঙ্কহাউসের জানালায়। গুলির

শব্দ হলো পরমুহূর্তে। কানের পাশ দিয়ে কেবিনে গিয়ে বিঁধলো গুলিটা। ডাইভ দিয়ে সরে গিয়ে গুলি করলাম সাথে সাথে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। দ্রুত আরও একটা গুলি করলাম সেদিকে।

দরজায় গিয়ে লাগলো—সম্ভবত চৌকাঠে। পরক্ষণেই খুলে গেলো দরজাটা। মাটিতে পড়ে থাকা লণ্ঠনের আবছা আলোয় দেখলাম, মাথা নিচু করে ছিটকে বেরিয়ে এলো রেসি। হাতে রাইফেল। ঘুর পথে দৌড়ে যাচ্ছে আস্তাবলের পেছনে।

আরও একবার গর্জে উঠলো আমার রাইফেলটা। চলন্ত টার্গেট। হাতটা একটু কেঁপে গেলো টেনশনে। লাগলো না গুলিটা।

লণ্ঠনের আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখলাম পিয়োর মুখটা। বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে বেরুলো আস্তাবল থেকে। বিদ্যুত গতিতে চলে গেলো আস্তাবলটার পেছনে।

রেসির সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন আমার দিকে। খেয়াল করলো না পিয়োকে। ছুটতে ছুটতে আরও একবার গুলি করলো সে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো আস্তাবলটার পেছনে। নিরাপদ জায়গায়।

একটা ধাতব সংঘর্ষ হলো কয়েক সেকেণ্ড পর। তারপর আরও একটা।

পরমুহূর্তেই দৌড়ে আবার আস্তাবলে ঢুকলো পিয়ো। রেসির রাইফেলটা ওর হাতে। বেরিয়ে এলো জিন চাপানো দুটো ঘোড়া নিয়ে। 'জলদি করো, ক্যাপ্টেন। বেজন্মাটার খুলিটা যেন ইস্পাতের তৈরি। আরেকটু হলে পাথরটাই ভেঙ্গে যেতো।'

লাফ দিয়ে উঠে বসলাম জিনে। পিয়ো আমার আগেই ছুটতে শুরু করেছে।

পরপর কয়েকটা গুলি হলো পেছনে। আন্দাজের ওপর ভর করে

গুলি ছুড়ছে ওরা। ততক্ষণে কয়েকটা চাঁইয়ের আড়ালে অন্ধকারে মিশে গেছি আমরা।

হঠাৎ পাহাড়ের ঢালের দিকে ঘোড়া ছোটালো পিয়ো। ট্রেইলটা দেখা যাচ্ছে না এখানে। যদিও মরুভূমির ট্রেইল সাদা দেখা যায় অন্ধকারে।

খুব দ্রুত যাচ্ছে পিয়ো। বেড়ালের দৃষ্টি ওর। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে পথ ঘাট।

ছোটো খাটো ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে উঠে এলাম ওপরে। ছুটে চললাম আঁকা বাঁকা অসমতল ট্রেইল ধরে।

কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটালো পিয়ো। আস্তে আস্তে আরও উঁচুতে উঠছে পথটা। শেষ হয়েছে মেসায় গিয়ে। নেমে পড়লো পিয়ো ঘোড়া থেকে। কি যেন দেখলো ঝুঁকে। তারপর আবার চড়ে বসলো। 'কাম অন ক্যাপ্টেন। পেয়ে গেছি ট্রেইলটা।'

মিনিট পাঁচেক পর নামতে শুরু করলাম নিচে। হঠাৎ মনে হলো একটা গাড়ির শব্দ এলো কানে।

পুরো দৃশ্যটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তিনটা মেয়ে। লিণ্ডা হুইলে। পাশে মার্থা। পেছনের সীটে বেলি। ফাঁকা রাস্তায় তীর বেগে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ বেঞ্জ। কথায় মশগুল ওরা। র‍্যাঞ্চের ঘটনাটা বলছে বেলি। যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে চাইছে, মানসিক বিকার ঘটেনি ওর।

হঠাৎ আড়াআড়িভাবে দুটো হেড লাইট জ্বলে উঠলো সাইড রোড থেকে। পরক্ষণেই পাহাড়ী ঢালু রাস্তা বেয়ে যমদূতের মতো নেমে এলো একটা জীপ। স্বভাবগত কারণেই সংঘর্ষটা এড়াতে চাইলো লিণ্ডা। দ্রুত বাঁয়ে কাটলো স্টিয়ারিংটা···খাড়া ঢাল ··সোজা দুশো ফুট

নিচে গিয়ে পড়লো গাড়িটা। বিকট শব্দ হলো ফুয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের।

এতেও নিশ্চিত হবে না মার্ক উইলসন। ঢাল বেয়ে নেমে যাবে স্পটে। স্বচক্ষে দেখবে সবকিছু। কিছু বাকি থাকলে নিজ হাতেই সারবে সেটুকু।

নুড়ি পাথর বিছানো কতটুকু জায়গা হাঁটিয়ে নিলাম ঘোড়াটা জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদূর আর?'

আঙুল তুলে পাহাড়ের প্রান্ত সীমাটা দেখালো পিয়ো। 'ওখানে ফায়ার রোড।'

জীপের শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটু পর। এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ী পথে গোঁ গোঁ শব্দ করে ছুটে গেলো জীপটা। তারপর থেমে গেলো হঠাৎ। পৌঁছে গেছে তেমাথার কাছে। প্রস্তুত অ্যাকশনের জন্য।

হঠাৎ চোখে পড়লো মাসিডিজ বেঞ্জের আলোটা। হাইওয়ে ধরে দ্রুত ছুটে আসছে লিণ্ডা।

উল্কার বেগে ছোটালাম ঘোড়াটা। হাইওয়েতে উঠে পথ আগলে দাঁড়ালাম ওদের। মাত্র কয়েক গজ দূরে থাকতেই স্কিড করে থেমে দাঁড়ালো গাড়িটা। এক ঝটকায় দরজা খুলে লিণ্ডাকে ঠেলে দিলাম পাশে।

ভয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিলো লিণ্ডা। কিন্তু ততক্ষণে গতি ফিরে পেয়েছে মাসিডিজ বেঞ্জ। এখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে বিশ্বাস করবে না ওরা। দেখাতে হবে, কোথায় কিভাবে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে ওদের জন্য।

'তোমাদের সবাইকে মারার প্ল্যান করেছে কলিন,' গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে বললাম আমি। 'মার্ক উইলসন জীপ নিয়ে অপেক্ষা

করছে ফায়ার রোডের মোড়ে। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে।'

দ্রুত ছুটে চলেছে মার্সিডিজ বেঞ্জ। তেমাথার কাছে সাদা জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। হাইওয়ের সাথে ফায়ার রোড মিশেছে ওখানটায়। মোড়ের কিছু আগে থাকতেই চেপে ধরলাম অ্যাক্সিলারেটরটা।

হঠাৎ চোখ ধাঁধানো দুটো হেড লাইট জ্বলে উঠলো ডানদিকে। পরক্ষণেই দেখা গেলো জীপটা। বজ্রের শব্দ করে নেমে আসছে ঢালু রাস্তা বেয়ে। টানটান হয়ে উঠলো শরীরের প্রতিটি পেশী। শক্ত হাতে চেপে ধরলাম হুইলটা। অ্যাকসিলারেটরটা পুরো দাবিয়ে দিলাম নিচে। জীপের নাকের ডগার চার আঙুল সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলো মার্সিডিজটা।

চাকা ঘষার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো পেছনে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে উইলসন জীপটা নিয়ন্ত্রণে আনতে। কিন্তু জানি আমি, পারবে না ও। মোড় থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে দাঁড় করালাম গাড়িটা। ব্যাক গিয়ার দিলাম তারপর।

দ্রুত নেমে পড়লাম মোড়টার কাছে এসে। দৌড়ে গেলাম হাইওয়ের ধারে। রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ভেঙ্গে দিয়ে খাদের ভেতর বিস্ফোরিত হলো ফুয়েলট্যাঙ্ক। আগুন আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো জীপটা।

ঘোড়ায় চড়ে পিয়ো এসে দাঁড়ালো পাশে। রাইফেল ধরা হাতটা চাপড়ে ওর। 'অল্পের জন্য বেঁচে গেছো, ক্যাপ্টেন। প্রায় দিয়েছিলো পাঠিয়ে।'

গাড়ি থেকে নেমে এলো বেলি। আমার বাঁ হাতটা পেঁচিয়ে ধরলো শক্ত করে। লিণ্ডাও নামালো ওর দেখাদেখি! 'তুমি অবশ্যই ড্যান শারমান, তাই না? ছবি দেখেছি তোমার। সত্যিই মার্ক উইলসন

ছিলো জীপে ? কি ব্যাপার বলো তো ?'

'এই র‍্যাঞ্চের মালিক বেলি ডসন। টুমি রহস্য উদঘাটনের জন্য এখানে এসেছি আমি। আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার ভয় পাচ্ছিলো ওরা।'

আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালো পিয়ো। 'ক্যাপ্টেন, ওরা কিন্তু খুজবে আমাদের।'

'অলরাইট।' লিণ্ডার দিকে ফিরলাম। বেশি কথা বলে মেয়েটা। কিন্তু একটা ইস্পাত কাঠিন্য আছে ওর মধ্যে। মার্থা এখনও বসে আছে গাড়িতে। বোবা হয়ে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়। 'শহরে নিয়ে যাও বেলিকে। পৌঁছেই রিপোর্ট করবে কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশেষ করে টম রেলি। সে-ই তদন্ত করছে ব্যাপারটা।'

'তুমি যাবে না ?' জানতে চাইলে বেলি।

'র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি আমি। সেই দুর্গটায়। আরও কিছু প্রমাণ দরকার।'

'সাবধানে যেয়ো। কলিন এখন লেজ মাড়ানো সাপ।'

'মনে হয় না। সবকিছু কানে গেলে উকিল ডাকবে সে। মামলা মোকদ্দমার কথা চিন্তা ভাবনা করবে।'

ঘোড়াটার দিকে এগোতে গিয়ে ঘুরে তাকালাম। পারলে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিয়ো। গোলাগুলি হবার সম্ভাবনা আছে ওখানে।'

অনেক সময় লাগলো র‍্যাঞ্চে ফিরে আসতে। নেমে পড়লাম বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। আলো জ্বলছে ভেতরে। পিয়োকে দাঁড়াতে বলে পা বাড়ালাম সেদিকে।

ফ্লোরে পড়ে আছে রেদি। লাশটা তুলে এনেছে ওরা। সোফায় আধশোয়া হয়ে বসা ড্যাড স্টাইল। চোখ বন্ধ করে আছে সে। বুকের

কাছে ব্যাণ্ডেজ।

ডোরির হাতে ড্রিংকস।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ওরা আমাকে দেখে। 'তুমি?' কলিনের দুচোখে বিস্ময়। 'কি চাও আবার এখানে?'

উঠে দাঁড়াতে গেলো স্টাইল। কিন্তু ব্যথায় নীল হয়ে গেলো মুখটা। বসে পড়লো আবার।

'মিস করেছে মার্ক উইলসন,' বললাম আমি। 'খাদে পড়ে গেছে জীপটা।'

চুপচাপ তাকিয়ে রইলো কলিন। হাতের গ্লাসটা দেখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

'বেলি চলে গেছে ওদের সাথে। পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলেছি ওকে।'

'জবর খেল দেখিয়েছো, রাইটার,' বললো সে।

'শুরুটা আপনারাই করেছিলেন, শেষটা করলাম। আমাকে এখানে ডেকে এনে খুন করার চেষ্টা না করলে হয়তো চাপা পড়ে থাকতো সবকিছু। নব্বই বছর আগের রহস্য রহস্যই থেকে যেতো। কিন্তু সে-সুযোগটা আর পাচ্ছেন না আপনি। এখন একটা কাজই বাকি আছে শুধু—জন টুমির দলিলটা খুঁজে বের করা।'

'আশা করি সবকিছু মনে থাকবে তোমার, শেরিডানা' মাঝখানে কথা বললো ডোরি।

সেই ছুরিটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ও। বুঝতে পারছে, শো ডাউনের সময় এসে গেছে। বাঁচাতে বলছে ওকে।

'অবশ্যই মনে থাকবে।' সান্ত্বনা দিলাম ডোরিকে।

হাতের গ্লাস থেকে ধীরে ধীরে চোখ তুললো কলিন। 'চারটা টেক্কা

তোমার হাতে থাকলেও ভয় নেই আমার। এখনও আমি দখলে আছি। কেউ হটাতে পারবে না আমাকে।'

জিম্বো এসে ঘরে ঢুকলো এমন সময়। দু চোখে খুনের নেশা। বক্সারদের মতো মাপা স্টেপে সামনে এসে দাঁড়ালো ও। সরে দাঁড়াবার আগেই দড়াম করে ওর প্রচণ্ড ঘুসটা এসে পড়লো চোয়ালে। তীব্র ব্যথায় অসাড় হয়ে গেলো গোটা শরীরটা। চোখের পলকে আবার ঘুসি চালালো জিম্বো। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিলাম একপাশে। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য তাল হারালো ও। ঠিক তখনই ঘুসি চালালাম ওর তলপেট লক্ষ্য করে। শরীরটা কুঁজো হয়ে গেলো জিম্বোর। সাথে সাথে জুডোর প্যাঁচ কষে হাঁটু দিয়ে গুতো মারলাম দুই উরুর সংযোগ স্থলে। স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেলো জিম্বোর শরীরটা। দড়াম করে আছড়ে পড়লো ফ্লোরে।

কিন্তু পড়েই মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওকি মানুষ? না পিশাচ? আর কেউ হলে অন্তত পনেরো মিনিটের জন্য পড়ে থাকতো অজ্ঞান হয়ে।

উঠেই ছোঁ মেরে একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিলো পাশের টেবিল থেকে। বিদ্যুৎ বেগে ছুঁড়ে মারলো বোতলটা আমার মাথা লক্ষ্য করে।

ঝুপ করে বসে পড়লাম। পেছনের দেয়ালে লাগলো বোতলটা। প্লিন্টারের মতো ছুটে গেলো ভাঙা কাচের টুকরোগুলো।

বসে থেকেই লাথি চালালাম। জিম্বোর হাঁটুর একটু ওপরে লাগলো লাথিটা। পড়ে গেলো ও।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম দুজনই। দরদর করে ঘামছি অবিরাম।

হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠলো জিম্বো। লাথি চালালো জোড় পায়ে।

সময় মতো সরে যেতে পারলাম না। চলন্ত ট্রাকের মতো বুকে এসে লাগলো লাথিটা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ছিটকে পড়লাম দূরে। ঝাপসা হয়ে গেলো দৃষ্টিটা।

একটু পর অনুভব করলাম, আমার বুকের ওপরে বসে দুই হাতে টিপে ধরেছে গলা।

কয়েক সেকেণ্ড পর চোখে আলো ফুটে উঠলো আবার। কণ্ঠনালীর ওপর ক্রমেই চেপে বসছে জিম্বোর আঙ্গুলগুলো। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

ছটফট করে উঠলাম বাতাসের জন্য। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো হাতাহাতি যুদ্ধের অনেক কলা কৌশল। কমাণ্ডো ট্রেনিং··· ভিয়েত-নামের জঙ্গল।

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথাটা একদিকে কাত করলাম একটু। তারপরই দুই হাতে চেপে ধরলাম ওর কড়ে আঙ্গুল দুটো। ফিঙ্গার জুডোর প্যাঁচ কষতেই মড়াৎ করে ভেঙে গেলো আঙ্গুল দুটো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো জিম্বো। অসহ্য যন্ত্রণায় অমানুষিক শোনালো ওর গলা। কণ্ঠনালী থেকে ছুটে গেলো হাত। অবাক হয়ে দেখছে ভাঙা আঙ্গুল দুটো। কিন্তু বুকের ওপর থেকে নামলো না তিনমণি শরীরটা।

শুয়ে শুয়েই কারাতের কোপ মারলাম জিম্বোর ঘাড়ে। কানের ঠিক নিচে। দুটো হাতই সাময়িকভাবে অকেজো ওর। বেকায়দা দেখে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ালো। উঠেই ডান পায়ে লাথি চালালো আমার পাঁজর বরাবর। খপ করে ধরে ফেললাম পা-টা। একটা মোচড় দিয়ে ঠেলা দিতেই ছিটকে পড়লো দূরে। একটা হাত চাপা পড়ে গেলো শরীরের নিচে। মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো তীব্র

ব্যথায়।

আড় চোখে দেখলাম, একট চেয়ার হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কলিন। বিদ্যুৎ বেগে নামিয়ে আনলো চেয়ারটা আমার মাথা লক্ষ্য করে। গড়িয়ে সরে গেলাম এক সেকেণ্ড আগে। ফ্লোরে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো চেয়ারটা।

উঠে দাঁড়ালাম চেয়ারের ভাঙা একটা পায়া নিয়ে। মৃত্যুভয় দেখতে পেলাম কলিনের চেহারায়। কিন্তু আমার টার্গেট জিম্বো। জোড়া পায়ের লাথির বিলটা এখনও শোধ করা হয় নি।

স্খলিত পায়ে এগিয়ে গেলাম জিম্বোর দিকে। শরীরের নিচে বেকায়দাভাবে পড়ে থাকা হাতটা মুক্ত করে উঠে বসার চেষ্টা করছে জিম্বো।

কুড়োলের কোপের মতো পায়াটা তুললাম ওর মাথার ওপর। দুই হাতে মাথাটা আড়াল করে ছেঁচড়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করছে জিম্বো। চোখে মুখে তীব্র আতঙ্ক। আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষা নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও।

'নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না, মিস্টার শেরিডান।'

মাঝপথে থেমে গেলো হাতটা। চমকে তাকালাম দরজার দিকে। টম রেলি এবং দু'জন হাইওয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। খুব সম্ভব কিছুক্ষণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। উপভোগ করছিলো মারামারিটা।

কলিনের দিকে তাকালো রেলি। 'মিস্টার কলিন, শহরে যেতে হবে আপনাকে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

পায়াটা ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। পুলের ড্রেসিং রুমে ঢুকে পানি ছিটালাম চোখেমুখে। জ্বলে উঠলো ডান চোখের

নিচটা। ফুলে আছে জায়গাটা।

'ড্যান?'

চমকে তাকালাম পাশে। 'বেলি? তুমি? তোমাকে না শহরে পাঠালাম?'

'ফিরে এসেছি। তোমাকে এখানে রেখে দূরে থাকতে পারি না আমি। পথে পেট্রল পুলিশের সাথে দেখা হলো। চলে এলাম ওদের গাড়িতে চেপে।'

'এসো। কিছু কাজ বাকি আছে এখনও।'

দুর্গের দিকে যাবার সময় পিয়ো এসে যোগ দিলো সঙ্গে। 'রাইফেলটা ধরো, ক্যাপ্টেন,' বললো সে। 'পুলিশ অফিসারটা চেনে আমাকে। হাতে রাইফেল দেখলে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে।' দাঁত বের করে হাসলো পিয়ো। 'তুমি আমার জন্য সুপারিশ করো, ক্যাপ্টেন। জীবনে এই প্রথম কোনো অন্যায় করি নি আমি।'

'অবশ্যই, পিয়ো।'

ড্যাড স্টাইলের ইলেকট্রিক লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লাম দুর্গের ভেতর। পেছনের দেয়ালের নিচ থেকে তৃতীয় সারির টাইলগুলো গুণতে শুরু করলাম এক এক করে।

প্রত্যেকটা টাইলই দেখতে এক রকম। এক বাই এক ফুট। বারো পর্যন্ত গুণে থামলাম। দুটো টোকা দিলাম টাইলটার ওপর। ঢপ ঢপ শব্দ হলো। ফাঁপা মনে হলো ভেতরটা। তীক্ষ্ণাগ্র একটা তাবুর খুঁটি পড়েছিলো এককোণে। ওটা দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেললাম টাইলটা। বেরিয়ে পড়লো পাথরের তৈরী একটা ওয়াল কম্পার্টমেন্ট। কনুই পর্যন্ত হাত ঢোকালাম ভেতরে। ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ লাগলো আঙ্গুলে। কাঁপা হাতে বের করে আনলাম ছোট্ট টিনের

বাক্সটা।

তাবুর খুঁটি দিয়ে ভেঙে ফেললাম তালাটা। বেরোলো অয়েল-স্কিন সিকারে মোড়ানো দুই বর্গ ফুটের একটা ট্যান ড করা গরুর চামড়া। একপাশে ইণ্ডিয়ান পিকচার রাইটিং। অপর পাশে স্পেনীয় ভাষায় লেখা একটা বিধিসংগত দলিল। সই এবং সীল করা।

'ভীষণ সাবধানী লোক ছিলো জন টুমি,' বললাম। 'অ্যাপাচিদের কাছ থেকে এই জায়গাটা কিনেছিলো সে। ইণ্ডিয়ান পিকচার রাইটিঙে বিশদ বর্ণনা দেয়া আছে জায়গাটার। তারপর খুঁজে বের করে সেই মেক্সিকান পরিবারটা, স্প্যানিশ গভর্ণমেন্ট থেকে যারা এটা অনুদান হিসেবে পেয়েছিলো। তাদের দাবীটাও কিনে নেয় টুমি। এখন সবকিছুই তোমার, বেলি। আইনগত ব্যবস্থাটা সেরে ফেলো শিগগির।'

'তুমি কোথায় যাবে এরপর?'

'কোর্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলিলটা তোমার হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আরও কছুদিন থাকবো এখানে। তারপর চলে যাবো।'

দলিলটা হাতে করে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। জোৎস্না প্লাবিত বিশাল র‍্যাঞ্চ।

আমার একটা হাত চেপে ধরলো বেলি।

'আমি বড্ড একা, ড্যান। আমার একজন সঙ্গী দরকার।'

মুখোমুখি দাঁড় করালাম বেলিকে। ওর কপালের ওপর এসে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে দিলাম আলতোভাবে।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে টুমির লেখাটার কথা ভাবলাম। জায়গা কেনার ডকুমেন্টটা কোথায়, কিভাবে পাওয়া যাবে, সব উল্লেখ ছিলো ডায়রির পাতায়।

আরও কিছু লেখা ছিলো সেখানে। টুমির শেষ কথা। সম্ভবত এরপরই পাতাগুলো ঠেসে ভরে দিয়েছিলো পিস্তলের নলে।

'আমার অনুরোধ, যে কারো হাতেই এই পাতাগুলো পড়ুক না কেন, অনুসন্ধান করে দেখবেন, কারা এই ক্রাইমটা করেছিলো। প্রকাশ করে দেবেন তাদের অপরাধ। সবাই দেখুক, শিখুক, অসৎ থেকে কোনোদিনও ভালো ফল আশা করা যায় না।'

জন টুমির উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো আমি: হোয়েন হি লোডেড দ্যাট পিস্টল ফর দ্য লাস্ট টাইম, হিট ওয়াজ রিয়্যালি লোডেড। ॥ শেষ ॥

অবসর বোমাস। একটি ওয়েস্টার্ন গল্প

প্রতিশোধ

মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার কাছে গিয়ে থামলো ঘোড়সওয়াররা। 'ম্যাচ জ্বালাও, মার্নো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো নাথান এমব্রি। 'এক-টাকে পেয়েছি শেষ পর্যন্ত।'

জিন থেকে নেমে ম্যাচ জ্বালালো মার্নো। উপুড় হয়ে আলোটা ধরলো দেহটার মুখের ওপর।

হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। গুলিটা লেগেছে মাথায়। কিন্তু মুখটা আশ্চর্য রকম শান্ত। কোনো রকম যন্ত্রণার লেশ মাত্র নেই সেখানে। মুখটা ওর চেনা। বেঁচে থাকার জন্য সারাটা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছে এই লোকটা। মার্নো ফ্যারেলের বাবা। জিম ফ্যারেল।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মার্নো লোকটার দিকে। কিছুক্ষণ আগে ও গুলি করে মেরেছে তাকে। যে লোকটা ওকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলো। চেয়েছিলো কিছুটা জ্ঞান দিতে। মানুষের মতো মানুষ করতে। আজীবন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়তে লড়তে আজ হঠাৎ করে থেমে গেলো। নিষ্ঠুরভাবে খুন হলো তার আপন সন্তানের হাতে। যে সন্তানকে সে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতো।

'মাই গড।' পাশ থেকে হিসহিস করে উঠলো অপর ঘোড়সওয়ার

জুড বোম্যান। 'না-না। এ হতে পারে না। কিছুতেইনা।'

হঠাৎ গলার স্বর সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো নাথানের। কিছুটা ক্রোধ এবং কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'এ জন্যই এতদিন কোনো রাসলার (গবাদি পশু চোর) ধরতে পারো নি তুমি, মার্নো? আগে ভাগেই জেনে যেতো, কখন এবং কোথায় ঢু মারতে হবে। আজ বুঝতে পেরেছি কেন আমাদের চেয়ে সবসময় একধাপ এগিয়ে থেকেছে ওরা।'

আকস্মিক আঘাতটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি মার্নো। কাঠিটা নিভে যাওয়ার পরও বসে রইলো মৃতদেহটার পাশে। শোকে মুহ্যমান। নাথানের একটা কথাও ঢুকছে না কানে।

'ওসব তুমি বিশ্বাস করো না, নাথান,' জোর প্রতিবাদ করলো বোম্যান। 'রাসলারদের ধরার জন্য শক্ত পরিশ্রম করেছে মার্নো। বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি কর্তব্যে। এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিও নিয়েছে অনেকবার। ওর জন্যই কদিন আগে তোমার চুরি যাওয়া গরু দুটো ফিরে পেয়েছো।

'আহ্-হা।' অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললো নাথান।' অন্য কেউ পেলো না, অথচ ও কি করে পেলো? কারণ ও জানতো, কোথায় পাওয়া যাবে। চুরি শুরু হয় কখন থেকে? যেদিন থেকে ওকে আমার ফোরম্যান নিযুক্ত করেছি তখন থেকে নয়?'

উঠে দাঁড়ালো মার্নো ফ্যারেল। 'কি বলছো তুমি, নাথান?'

নাথান এমব্রি এই এলাকার সবচেয়ে বিত্তশালী লোক। প্রায় ছশো গবাদি পশুর মালিক। অতিরিক্ত জেদী আর সন্দেহ প্রবণ। একবার মাথায় কিছু ঢুকে গেলে কার সাধ্যি তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলায়। হঠাৎ মেঘের ভেলা থেকে বেরিয়ে এলো একফালি চাঁদ। ম্লান একটা আলো পড়লো ঘোড়সওয়ারদের চোখে মুখে। তার যুবক

ফোরম্যানের দিকে তাকালো নাথান। 'তোমাকে গুলি করে মারা উচিত, মার্নো। কিন্তু একটা সুযোগ দিচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে চলে যাও এই অঞ্চল ছেড়ে। তোমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না আমি। কিন্তু এর পরও যদি তোমাকে এখানে দেখা যায়, কপালে ভীষণ খারাবী আছে।'

পুরো একটা মিনিট কোনো কথা সরলো না মার্নোর মুখ দিয়ে। চলে যাবার জন্য ঘোড়সওয়াররা যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভাষা খুঁজে পেলো ও। 'তুমি আমাকে চুরির অপবাদ দিচ্ছো, নাথান?' চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠলো ওর। 'আজ পর্যন্ত যে কথাটা কেউ বলতে পারে নি, তাই বলছো তুমি? আর যা-ই বলো নাথান, চোর বলো না আমাকে। আগুনে হাত দিতে যেয়ো না'।

ঘুরে তাকালো নাথান। 'অবশ্যই বলবো। একশোবার বলবো। যে তার বাবাকে গুলি করে মারতে পারে, সে সবকিছুই পারে। আমরা জানি তুমি একজন ভালো গান ফাইটার। কিন্তু কাল সকালে যখন রটে যাবে তুমি তোমার বাবাকে খুন করেছো, সবাই থুথু দেবে মুখে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মার্নো। কেমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলছে লোকটা। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ও। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনার পর নাথান নিজেই আদেশ দিয়েছিলো গুলি করতে। তারপরই জিনে বসা একটা ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে ও।

'তোমার বাবা যদি মারা না যেতো, অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারতো, কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতো না। এখন আর সে-সুযোগটা নেই তোমার। শেষ হয়ে গেছো এই অঞ্চলে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে পালাবার।'

রক্ত উঠে গেলো মার্নোর মাথায়। কিন্তু অবস্থাটা অনুকূলে নয় দেখে শান্ত রাখার চেষ্টা করলো নিজেকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'তুমি বলতে চাইছো এর শেষ না দেখেই চলে যাবো আমি? বিনা ট্রায়্যালেই আমাকে আর বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করবে তুমি? আর তা মাথা পেতে নেবো? কক্ষনো নয়।'

'ট্রায়্যাল?' গর্জে উঠলো নাথান। 'গরু নিয়ে পালাবার সময় চোরের পাছে ধাওয়া করলাম। একজনকে গুলি করে ফেলে দিলে তুমি। এবং দেখা গেলো সেটা তোমার বাবা। আর কি প্রমাণ দরকার আছে? তোমার তো ফাঁসি হওয়া উচিত। শুধু বেঁচে গেলে আমার মেয়ের বন্ধু বলে। চব্বিশ ঘণ্টা পর এই এলাকার ত্রিসীমায় যেন তোমার মুখ আর না দেখি।'

ঝড়ের বেগে চলে গেলো নাথান। পেছনে ছুটলো সবাই। শুধু বোম্যান একটু দেরি করলো যেতে। মার্নোর পাশে এসে একটা হাত রাখলো কাঁধে। 'সরি, মার্নো।' শান্ত গলায় বললো সে। 'আই অ্যাম রিয়্যালি সরি।'

অন্ধকারে একা ওর বাবার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো মার্নো। ক্ষুরের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে।

ঘুমের মধ্যে মানুষ যেভাবে হেঁটে বেড়ায়, ঠিক সেইভাবে ওর ঘোড়াটার কাছে গেলো ও। লাগাম ধরে টেনে আনলো ওর বাবারটার পাশে। লাশটা তুলে আড়াআড়ি করে রাখলো জিনের ওপর। তারপর রওনা হলো বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে ভাবছে, সবকিছুই শেষ হয়ে গেলো আজ। র‍্যাঞ্চের মনের মতো চাকরি, মিষ্টি মেয়ে লারা, সব—সব শেষ হয়ে গেলো আজ।

অন্ধকারে ভুতুড়ে বাড়ির মতো লাগছে ওদের পুরনো বাড়িটা। মার্নোর শৈশব আর কৈশোর কেটেছে এখানে। এখন ও তেইশ বছরের শক্ত সমর্থ যুবক।

ভেতরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালালো মার্নো। সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেলো কাজে। কয়েকটা তক্তা দিয়ে কফিন তৈরি করে ফেললো একটা। তারপর লাশটা ভেতরে রেখে বয়ে নিয়ে গেলো বাড়ির পাশে সবুজ চত্বরে। একটা গাছের নিচে। ওর মায়ের কবরের পাশে। মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো মার্নো। চোখ দুটো ভরে গেলো পানিতে। হুহু করে উঠলো বুকের ভেতর। কফিন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলো, এ খুনের প্রতিশোধ ও নেবেই নেবে।

কেবিনে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলালো মার্নো। কি নেবে সঙ্গে? মানুষের মৃত্যু তো চির সত্য। কিন্তু যতদিন বেচে আছে, চাই খাবার আর গুলি বন্দুক। এ দুটো জিনিসই নেবে ও।

ওর বাবার ছিলো পুরনো একটা শার্প পয়েন্ট ফিফটি। আর নতুন একটা পয়েন্ট ফরটিফোর উইনচেস্টার।

কিন্তু উইনচেস্টারটা গেলো কোথায়?

শির দাঁড়ার ভেতর একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলো মার্নো। রাইফেল দুটো বরাবর যেখানে থাকে, একটা র‍্যাকের ওপর, শুধু শার্পটাই আছে সেখানে। উইনচেস্টারটা গায়েব। ও জানে, বাবার জিনে স্ক্যাবার্ড নেই। তাছাড়া রাত-বিরেতে কোথাও বেরুলে শার্পটাই সঙ্গে নিয়ে বেরুতো সে। এই রাফেলো হান্টিং রাইফেলটা অত্যন্ত প্রিয় ছিলো তার।

একটা ভয়ভয় ভাব ঘিরে ধরলো ওকে। কেমন যেন উল্টো পাল্টা, আগোছাল লাগছে সবকিছু। যে জিনিসটা সব সময় যেখানে দেখে

এসেছে, সেখানে নেই সেটা। মনে হচ্ছে, বাইরের কেউ ঢুকেছিলো কেবিনে। নাড়াচাড়া করেছে এটা ওটা। হঠাৎ ওর বাবার লুকোনো, টাকাগুলোর কথা মনে পড়তেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো খাটের পাশে। মাত্র কয়েকশো ডলার। বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করেছিলো সে পাটাতনের একটা তক্তা সরিয়ে হাত ঢোকালো ভেতরে। নেই টাকা লো।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মার্নো। পকেটগুলো সার্চ করেও পেলো না কিছু। কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর চোখ বুলালো আরও একবার। নেভা স্টোভের ওপর কফিপটটা দেখে এগোলো সেদিকে। ঢাকনা খুললো পটের। অনেকটা কালো কফি আছে এখনও। হয় কেউ বানিয়ে খেয়ে পটটা ওখানেই রেখে গেছে, নয়তো ওর বাবা নিজেই তৈরি করেছিলো। সময় পায় নি খাবার। আগুনটা নিভিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে কেবিন থেকে। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে মার্নো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটী থাকা ভীষণ পছন্দ করতো ওর বাবা। স্টোভের ওপর আধোয়া কফিপট অথবা খাবার পর এটো ডিশপ্লেট ফেলে রাখার মতো মানুষ ছিলো না সে।

জিনিসপত্র প্যাক করার সময় একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো ও, হয় ওর বাবাকে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে সতর্ক করে দিয়েছে কেউ, নয়তো জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আপাতত তিনটা প্রশ্নের জবাব পেতে হবে ওকে। হারানো উইনচেস্টার, হারানো টাকা আর কফিপট।

রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো মার্নো। নিজের ঘোড়াটা ছাড়া আরও একটা ঘোড়া নিলো সঙ্গে। প্যাক হর্স। ছুটে চললো ইণ্ডিয়ান

ক্রীকের দিকে। মনে মনে একটা অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। কপালে যাই থাকুক, আসল ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত এই অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যাবে না ও। মার্নো জানে, এই তল্লাটে ওর বাবার মতো এত সৎ লোক আর দ্বিতীয়টি ছিলো না। জীবনে এমনও অনেক সুযোগ এসেছে তার, একটু এদিক সেদিক করলেই পায়ের ওপর পা তুলে খেয়ে যেতে পারতো সারাজীবন। কিন্তু নিজের নয় এমন এক পয়সা দামের একটা জিনিসও ছুঁয়ে দেখেনি সে।

ক্যানিয়ন ধরে যেতে যেতে বারবার ব্যাপারটা ভাবলো মার্নো। ওর বাবার কোনো শত্রু ছিলো না। মারামারি তো দূরের কথা কারও সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে এমন কথাও কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। অথবা হঠাৎ ভাবনাটা এলো মার্নোর মাথায়। ওর নিজের কোনো শত্রু নয় তো?

কিন্তু কারা ওর শত্রু? এমন কাউকে তো মনে পড়ছে না। বারে একবার একজনের সঙ্গে একটু হাতাহাতি হয়েছিলো। সে তো অনেক আগের কথা। কবেই মিটমাট হয়ে গেছে। নাহ্। মাথা নাড়লো মার্নো। ওর কোনো শত্রু নেই।

শুধু শুধু ওই রাসলারগুলো ছাড়া। কিছুদিন আগে চুরি যাওয়া দুটো গরু উদ্ধার করেছিলো ও। এবং এখনও, প্রায় রাতেই মাইলের পর মাইল ধাওয়া করে নিয়ে যায় ওদের। একমাত্র ওকেই যমের মতো ভয় করে রাসলাররা। হয়তো ওরাই প্রতিশোধটা নিলো এভাবে।

ইণ্ডিয়ান ক্রীকে এসে ঘোড়া থেকে নামলো মার্নো। জানে ও, অ্যাপাচিদের পরিত্যক্ত একটা গুহা আছে এখানে। একবার রাসলারদের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলো গুহাটা।

কাছেই সাউথ পিকে ঝর্ণা আছে একটা। যতদিন পর্যন্ত ওর বাবার খুনীকে ধরতে না পারছে, এটাই হবে ওর গোপন ডেরা।

প্যাক হর্স থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ঘোড়াটার কানে কানে কি যেন বললো মার্নো। আদর করে একটা থাপ্পড় দিলো পিঠে। ঘাড় উঁচু করে একবার তাকালো ঘোড়াটা। তারপর ছুটে চললো বাড়ির দিকে।

গুহার ভেতর সবকিছু রেখে আবার ঘোড়ায় উঠে বসলো ও। শহরে যাবে। যেভাবেই হোক, লারা এমব্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে। লারাকে ভালোবাসে ও।

রাত এগারোটা। ঘুমিয়ে পড়েছে পালো সেকো শহরটা। দু'চারটে পুরনো বাড়িতে বাতি জ্বলছে তখনও। এর একটা নাথান এমব্রির। ওর পুরনো বস।

বাড়ি থেকে প্রায় একশো গজ দূরে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো মার্নো। কাঠের গেটটা খুলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। বাগান পেরিয়ে উঁকি মারলো কাঁচের জানালা দিয়ে।

পেছন হয়ে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে লারা। সন্তর্পণে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো মার্নো। ছোট্ট করে দুটো টোকা মারলো দরজায়। দ্বিতীয় বার মারার পর থেমে গেলো পিয়ানো। পরক্ষণেই খুট করে খুলে গেলো দরজা।

'মার্নো, তুমি?' ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো লারা। 'বাবা দেখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! গুলি করে মারবে তোমাকে।'

'মারুক। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে আমার। আমি চুরি করতে পারি একথা তোমার বিশ্বাস

হয় লারা ?'

'না।' একটু ইতস্তত করলো লারা। 'কিন্তু তোমার বাবা—'

'কি বললে ? বাবা ? তার মতো বুড়ো সৎ লোককে চোর বলছো তোমরা ?'

'কিন্তু মার্নো, তুমি তুমি তাকে গুলি করে মেরেছো। বাবা বলেছে, ওই সময় সে রাসলারদের সাথে ছিলো।'

'না, লারা' শান্ত গলায় বললো মার্নো। 'হয়তো আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু জানি, আমার গুলির আগেই সে মারা গেছে।'

'আই অ্যাম সরি মার্নো। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। বাবার মনে যখন একবার সন্দেহটা ঢুকে গেছে, তোমার চলে যাওয়াই উচিত।' এক পা পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেলো লারা।

'শোনো লারা।' হাত দিয়ে দরজা ঠেলে রাখলো মার্নো। 'যা বললাম এটাই সত্য। বাড়ি গিয়ে দেখি বাবার উইনচেস্টারটা নেই। কিছু টাকা ছিলো তাও নেই। নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছিলো ঘরে। ধরে নিয়ে গেছে বাবাকে। এমনকি কফিটুকু খাবার সময় দেয়া হয় নি তাকে।'

'সরি, মার্নো। তুমি চুরি করতে পারো, বা চোরের সঙ্গে হাত মিলাতে পারো তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না, কাকে বিশ্বাস করবো। বাবা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবে না আমাকে। এখন দয়া করে যদি যাও···'

'লারা ?' নাথান এমব্রির গলা শোনা গেলো এমন সময়। 'কে ওখানে, মা ? কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি ?'

'কেউ না ড্যাড,' জোরে জোরে বললো লারা। 'ভুল শুনেছো তুমি।' তারপর হাত জোড় করলো মার্নোর দিকে তাকিয়ে। ফিসফিস করে বললো, 'প্লিজ, তুমি যাও এখন। বাবা এসে পড়বে।'

দরজা থেকে হাত সরিয়ে নিলো মার্নো। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই ওর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলো লারা।

ঘোড়ার কাছে এসে ভাবতে লাগলো মার্নো, রাতের বেলা স্বেচ্ছায় ওর বাবা বেরোয় নি বাড়ি থেকে। জোর করে বের করা হয়েছে তাকে। কিন্তু কারা? রাসলারদের কেউ নয়তো? ভাবা মাত্র উঠে বসলো জিনে।

একজন লোককে চেনে ও। লন মেলকর। অনেকদিন আগে ছিলো এই লাইনে। বয়সের কারণে এখন ছেড়ে দিয়েছে। থাকে ট্যাঙ্ক মেসার ওপর।

রাত দুপুরের পর লনের আস্তানায় পৌঁছলো মার্নো। চারপাশে কবরের নিস্তব্ধতা। গা ছমছম করে উঠলো ওর। অন্ধকার কেবিনের সামনে গিয়ে দেখলো, দরজা খোলা। অস্বাভাবিক মনে হলো ব্যাপারটা। বাইরে ঠাণ্ডা। দরজা খোলা থাকার কথা নয়।

'লন।' গলা খাটো করে ডাকলো ও।

সাড়াশব্দ নেই কারও। ভেতরে ঢুকে আবার ডাকলো বুড়ো রাসলারের নাম ধরে। এবারও সব চুপচাপ। সাহস করে ম্যাচ জ্বালালো মার্নো।

ফ্লোরে পড়ে আছে লন মেলকর। অচেতন। গায়ের শার্টটা রক্তে ভেজা।

দ্রুত লণ্ঠন ধরিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করলো মার্নো। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে। কাঁধের মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা।

জখম মারাত্মক নয়। কিন্তু রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। স্টোভে গরম পানি চাপিয়ে আবার এসে বসলো লনের পাশে। রক্তাক্ত শার্টটা খুলে ফেললো শরীর থেকে। গরম পানি দিয়ে ধুইয়ে দিলো ক্ষতটা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় গুঙিয়ে উঠলো লন। চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করলো মার্নোকে।

'মার্নো!' ফিসফিস করে উঠলো লন। 'তুমি দেখেছো ওদের?'

'কারা ওরা, লন? ওরা গুলি করেছে তোমাকে?'

'হ্যা। রাসলাররা। নিজের দোষেই গুলি খেলাম। জানতাম, জো খুব খারাপ লোক।'

'কে সে? জো বানতার কথা বলছো তুমি?'

'হ্যা। মাসখানেক আগে একটা লুকোনোর জায়গা খুঁজতে আসে এখানে। খারাপ লোক জেনেও তাকে থাকতে দিলাম। তার মানে বাধ্য ছিলাম। তাড়াবার সাহস ছিলো না আমার। আজ সন্ধ্যায় আরও দু'জন লোক আসে ওর কাছে। বুঝতে পারলাম গরু চুরির শলাপরামর্শ করছে ওরা। বেশ কিছুদিন ধরে ওরাই চুরি করছে নাথানের গরু। যাবার সময় বাধা দিলাম আমি। কথা কাটাকাটি হয় বানতার সঙ্গে। এবং এক পর্যায়ে বানতার এক সঙ্গী গুলি করে পেছন থেকে।'

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে লনের কথা বলতে। দম নেয়ার জন্য একটু থামলো সে। তারপর আবার শুরু করলো। 'কিভাবে যে ঘোড়ায় গিয়ে চড়লাম মনে নেই। তোমাদের বাড়ির দিকে ছুটলাম। কিন্তু যেতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। কাছাকাছি গিয়ে পড়ে গেলাম জিন থেকে। চিৎকার শুনে ছুটে এলো তোমার বাবা। তাকে বললাম ওদের কথা। এক মুহূর্ত দেরি করলো না সে। আমাকে ঘোড়ায় তুলে দিয়ে তখনই ছুটে চললো নাথানকে খবর দিতে।'

'যেতে পারে নি সে, লন। পথেই খুন করা হয়েছে তাকে। আমাদের বাড়িটাও লুট করা হয়েছে।' সংক্ষেপে সবকিছু বললো মার্নো।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলো বৃদ্ধ। 'নাথান একটা গর্দভ। মোটা বুদ্ধি। মার্নোর একটা হাত চেপে ধরলো সে। 'তোমার কিছু লোক দাও আমাকে, মার্নো। আমি জানি বানতা কোথায় আছে। আমিও এক সময় ছিলাম এই লাইনে। বুররো স্প্রিংস-এর পুরনো আস্তানায় গেলে পাবে ওকে। ডার্ক ক্যানিয়ন ধরে যেতে হয় ওখানে। ক্যানিয়নের ডান পাশটা মাথা সমান উঁচু উঁচু পাথরের চাঁইয়ে ভর্তি। চুরি করা গরু লুকোবার সেরা জায়গা। কাছেই বর্ডার। পাচার করতে সুবিধা। ইচ্ছা করলে মাইনিঙ ফিল্ডেও বেচে দিতে পারে।'

শুনে ইতস্তত করতে লাগলো মার্নো। বুঝতে পেরে জোর করে একটু হাসলো বৃদ্ধ। 'আমার জন্য ভেবো না, বয়। ঠিক হয়ে যাবো। তুমি যাও।'

পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে সেই সময় ডার্ক ক্যানিয়নে গিয়ে পৌঁছলো মার্নো। মরুভূমির এই এলাকাটা জন বিরল। আত্মগোপন করা ছাড়া এদিকটা মাড়ায় না কেউ। সরকারের তরফ থেকে বেশ কবার সার্চ করার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো এলাকাটা। কিন্তু এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা পাথরের চাঁইগুলোর জন্য বার বার ব্যর্থ হয়েছে তাদের সে প্রচেষ্টা। কোথাও কোথাও এমনভাবে গায়ে গায়ে লাগানো সেগুলো, দেখে মনে হয় পথ নেই যাবার। তারপর আছে পানির ঢল। বৃষ্টির সময় প্রচণ্ড বেগে পানি নেমে আসে ক্যানিয়নের ওপর থেকে। একবার নিচে আটকা পড়ে গেলে বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এখন জেনে গেছে মার্নো, রাস্তা আছে যাবার। খুব সাবধানে এগোচ্ছে আর লনের কথাগুলো ভাবছে। মাঝেমাঝে এমন ভাবে পড়ে আছে চাঁইগুলো, মনে হচ্ছে ওখানেই ব্লক হয়ে গেছে পথ। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যাচ্ছে, এঁকেবেঁকে একটা সরু পথ চলে গেছে আরও ভেতরে। একটা ঘোড়া বা গরু চলতে পারে কোন রকমে। লন মেলকরের কথাগুলো দারুণভাবে কাজ করছে ওর মধ্যে। আরও কিছুদূর যাবার পর একটা দাগ দেখতে পেলো ক্যানিয়নের দেয়ালে। সাধারণত পাথরের দেয়ালে রেকাবের ঘষা লেগে এমন দাগ পড়ে। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এখন ছুটে চলেছে ও। ঝুল পাথরের জন্য মাথাটা নিচু করতে হচ্ছে বারবার।

কিছুদূর পর আশ্চর্যরকম একটা বাঁক নিয়েছে পথটা। সাবধানে বাঁকটা ঘুরে ছুটে চললো আবার। গিয়ে পড়লো অপেক্ষাকৃত একটা সমতল জায়গায়। ক্যানিয়নের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ট্রেইল দেখে ঘোড়া থামালো মার্নো। নেমে পরীক্ষা করলো। বন্য জীব জন্তুর ট্রেইল। ক্যানিয়নের ভাঙা পাথরের দেয়াল ঘেঁষে ওপরের দিকে চলে গেছে ট্রেইলটা। কাছাকাছি পানি আছে বলে অনুমান করলো ও। ছুটে চললো সেই পথে। বড় একটা বাঁক নিয়ে সবুজ মেসায় গিয়ে শেষ হয়েছে ট্রেইলটা।

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালো মার্নো। প্রায় পাঁচশো একরের মতো একটা ভ্যালি। সবুজ ঘাসে ঢাকা। কতগুলো গরু চরে বেড়াচ্ছে। এক পাশে দুটো কাঠের ঘর আর লম্বা একটা বাঙ্ক হাউস। আস্তাবলও আছে একটা। পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া পানি ধরে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রায় দশ মিনিট পর দু'জন লোক বেরিয়ে এলো বাঙ্ক হাউস থেকে।

হেঁটে আস্তাবলের দিকে গেলো তারা। দু'জনের একজনকে চিনতে পারলে মার্নো। জো বানতা।

বানতা এখানে নতুন এসেছে। খুব বেশি একটা পরিচিত নয়। মাঝে মাঝে শহরের বারে এসে বসে। যেচে কেউ আলাপ করতে চাইলেও এড়িয়ে যায়। প্রথম থেকেই লোকটার হাব ভাব, চালচলন পছন্দ ভালো ঠেকে নি মার্নোর। কেমন যেন একটু গোপনীয় স্বভাবের। নাথানের কানেও একবার কথাটা তুলেছে মার্নো। কিন্তু আমল দেয় নি নাথান।

আস্তাবল থেমে ফেরার সময় দ্বিতীয় লোকটাকে চিনতে পারলো মার্নো। আইক গুডরিচ। এক সময় নাথানের ফাইফরমাশ খাটতো। তাহলে সে-ও হাত মিলিয়েছে বানতার সঙ্গে?

দুই ঘণ্টা ওয়াচ করার পর নিশ্চিত হলো মার্নো। কমপক্ষে চারজন লোক আছে ভ্যালিতে। বানতা আর গুডরিচ ছাড়া আরও দুজনকে দেখেছে। একজনকে দেখেছে চৌবাচ্চা থেকে গামলায় করে পানি নিতে। সম্ভবত কুক। অপরজনকে দেখেছে চারটা জিন নিয়ে আস্তাবলে ঢুকতে। লোকটা লাল চুলো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। ক'দিন আগে অল্পের জন্য একটা লোককে ধরতে পারে নি ওরা। গুলি খেয়েও পালিয়ে যায়। খুব সম্ভব এই সেই লোক।

কারও সাহায্যের জন্য যাওয়ার সময় নেই এখন। যদিও কেউ ওর গল্পটা বিশ্বাস করে কিন্তু ফিরে এসে কাউকে পাওয়া যাবে না ওখানে। কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা লাগবে শহরে গিয়ে ফিরে আসতে। এর মধ্যে বর্ডারের ওপাশে চলে যাবে গরুগুলো।

মেসার ব্যাক ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করলো মার্নো। ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের ভেতর ঠেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেলো ভ্যালির মুখের কাছে। হাতে রাইফেল। ওখান থেকে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে একেবারে আস্তাবলের পেছনে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লাল চুলোটাকে। পেছন হয়ে একটা ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে সে। বিদ্যুৎ গতিতে লোকটার পেছনে চলে গেলো মার্নো।

'অল রাইট, রেড!' নিচু স্বরে বললো ও। 'গান বেল্টটা খুলে ঘুরে দাঁড়াও এবার। একটু এদিক-ওদিক করলেই গুলি করবো আমি।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো লাল চুলো। বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেছে তার। 'কোত্থেকে এসেছো তুমি?'

'বেল্টটা খুলে ফেলো! কুইক!' কঠিন আদেশ দিলো মার্নো।

লাল চুলোর একটা হাত উঠে গেলো বেল্টের হুকে। কিন্তু না খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো একপাশে। চোখের পলকে বের করে ফেলেছে পিস্তলটা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মার্নোর হাতের রাইফেল। মরণ চিৎকার করে উঠলো লাল চুলো। পিস্তলটা খসে পড়লো হাত থেকে।

একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো বাঙ্কহাউসের ভেতর। পর মুহূর্তে লাফিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো আইক গুডরিচ। মার্নো অপেক্ষা করছিলো তার জন্য। দ্বিতীয় দফা গর্জে উঠলো ওর রাইফেল। কোথায় লাগলো গুলিটা বোঝা গেলো না। কিন্তু বিকট চিৎকার করে দরজার বাইরে পড়ে গেলো গুডরিচ।

বাঙ্কহাউসের জানালা দিয়ে গুলি করলো কেউ। মাথা নিচু করে দৌড় দিলো মার্নো। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে দেখলো, উঠে বসার

বসার চেষ্টা করছে গুডরিচ। পেটটা চেপে রেখেছে বা হাতে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। ডান হাতে পিস্তল। তাক করার চেষ্টা করছে ওর দিকে। আরও একবার গুলি করলো মার্নো। কপালের মাঝখানে লাগলো গুলিটা। তৃতীয় একটা চোখ সৃষ্টি হলো গুডরিচের। দ্রুত রাইফেলটা ফেলে দিয়ে গুডরিচের পিস্তলটা তুলে নিলো মার্নো। এক লাফে চলে গেলো ঘরের ভেতর। জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলো বানতা। দু'জনেই গুলি করলো এক সঙ্গে। একটা শব্দ হলো দুটো গুলির। ক্লোজ রেঞ্জ। কিন্তু দু'জনেই মুভ করছিলো। ফলে দুটো গুলিই মিস হলো। বানতার গতি রোধ করার জন্য লাথি মেরে একটা টেবিল উল্টে দিলো মার্নো। মুহূর্তের জন্য একটু অসতর্ক হয়ে পড়লো বানতা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো মার্নো। ডান হাতের পেশী ফুটো করে বেরিয়ে গেলো গুলিটা। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো বানতা। আধপাক ঘুরে গেলো শরীরটা। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো মার্নো। সিক্স শুটারের বাট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলো ঘাড়ের পেছনে। পড়ে গেলো বানতা। এবং স্থির হয়ে পড়ে রইলো।

পাথরে জুতা ঘষার শব্দ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো মার্নো। দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে পাচকটা। হাতে একটা ডবল ব্যারেল শটগান।

'ড্রপ দ্য গান!' চিৎকার করে উঠলো সে। চোখে মুখে একটা প্রসন্ন ভাব। 'ফেলে দাও, নয়তো ঝাঁঝরা করে ফেলবো।'

লেভেলে উঠে গেলো মার্নোর পিস্তলটা। একটুও ইতস্তত করলো না ও। বললো, 'করো গুলি। আমি মরবো ঠিকই কিন্তু তোমাকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে। এত কাছের টার্গেট মিস হবে না আমার।'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করলো পাচকটা। পরিস্থিতিটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না তার। বুঝতে পারছে, একগুঁয়ে লোকটা সারেণ্ডার করার পাত্র নয়। সে গুলি করলে লোকটাও ছেড়ে কথা বলবে না। সিক্স শুটারের একটা গুলিই যথেষ্ট। এবং এই বয়সে মরার ইচ্ছা নেই তার।

'শুট!' চিৎকার করে উঠলো মার্নো। 'অথবা ফেলে দাও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো পাচকটা। ভাবলো, এভাবে অকাল মৃত্যুর চেয়ে দু'চার বছর জেল খাটা ঢের ভালো। ঝুঁকে শটগানটা ফ্লোরে রেখে দুপা পিছিয়ে গেলো সে।

পাচক আর বানতার হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে আর্মসগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করলো মার্নো।

দুপুরে পৌঁছলো পালো সেকো শহরে। খটখট করে খুলতে শুরু করলো ঘরবাড়ির দরজা জানালা। বাইরে এসে ছোট্ট মিছিলটার দিকে তাকালো সবাই। সবার আগে সাদা একটা ঘোড়ায় আইক গুডরিচ আর লাল চুলোর লাশ। তারপর জো বানতা আর পাচকটা। সবার শেষে মার্নো ফ্যারেল। রাইফেলটা আড়াআড়ি করে রাখা জিনের ওপর। গলায় বাঁধা স্কার্ফটা ফরফর করে উড়ছে বাতাসে।

একটা সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো নাথান এমব্রি। লারাকে দেখা গেলো পোস্ট অফিসের দরজায়।

'নাথান,' চিৎকার করে উঠলো মার্নো ফ্যারেল। অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেলো সেই চিৎকার। 'এই তোমার রাসলার। গরুগুলো পাবে ডার্ক ক্যানিয়নে। আগের লোকটা জো বানতা। সম্ভবত চেনো

না। খবর পেয়ে আমার বাবা ওদের থামাতে চেয়েছিলো। ওরাই গুলি করে মেরেছে তাকে। আমি ছিলাম ওদের বড় বাধা। তাই তোমার আমার মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টির জন্য বাবার লাশটা বয়ে নিয়ে যায় ওখানে। যখন আমি গুলি করি, লাশটা ফেলে পালিয়ে যায় ওরা। আমি ভাবলাম আমার গুলিতে মারা গেছে সে, আর তুমি সন্দেহ করলে সে ওদের সঙ্গে ছিলো। তাই না, বানতা?'

শ্রাগ করলো বানতা। 'এখন আর মিথ্যা বলে লাভ কি। শিওর। তুমি যা বলেছো তাই ঠিক। এটাই প্ল্যান ছিলো আমাদের। নাথান কোনো সমস্যাই নয়। আমরা থোড়াই কেয়ার করি তাকে। ডোবা থেকে একটা ব্যাঙ ধরার সাহসও নেই তার। আমাদের যত মাথা ব্যথা ছিলো তোমাকে নিয়ে।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেলো নাথানের মুখটা। 'আমি আমার দোষ স্বীকার করছি, মার্নো। আমি ঋণী তোমার কাছে। কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, তেমনটা ভাববার কারণ ছিলো আমার।'

অগ্নিদৃষ্টিতে নাথানের দিকে তাকালো মার্নো। 'বছরের পর বছর যে লোকটা তোমার জন্য কঠিন পরিশ্রম করলো তাকে অবিশ্বাস করার কারণ ছিলো? যে বৃদ্ধ লোকটা কারও জন্য এতটুকু ক্ষতিকর ছিলো না তাকেও সন্দেহ করার কারণ ছিলো তোমার? নাথান, এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করি উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে তোমার। ভবিষ্যতে এমন হুট করে জাজ করতে যেয়ো না কিছু। বিপদে পড়বে।'

চলতে শুরু করলো মার্নো। থেমে গেলো কিছুদূর গিয়ে। ফুট-পাতে দাঁড়িয়ে আছে জুড বোম্যান।

'বোম্যান, কাল একমাত্র তুমিই দুঃখ করেছিলে আমার জন্য।

তুমি না গরু কিনতে চেয়েছিলে? অল রাইট। প্রায় দেড়শোটার মতো আছে আমাদের।'

'বিক্রি করবে?' জানতে চাইলো বোম্যান।

'তোমার জন্য মাত্র এক হাজার ডলার। তবে কথা দিতে হবে, যতদিন বেঁচে আছো আমার মা বাবার কবর দুটো দেখা শোনা করবে।'

'মাত্র এক হাজার?' অবাক হলো বোম্যান। 'বাজারে নিলে তো ডবল দাম পাবে।'

'তোমাকে কত দিতে হবে শুনেছো। রাজি আছো?'

'শিওর, মার্নো।'

'অল রাইট। শেরিফের অফিসে লাশ দুটো বুঝিয়ে দিয়ে আসি। টাকাটা রেডি করো।'

লারা তখনও দাঁড়িয়ে আছে পোস্ট অফিসের সামনে। হঠাৎ মেয়েটার জন্য ভীষণ কষ্ট পেলো মার্নো। যদিও এখন বুঝতে পেরেছে, একটা দিনের জন্যও লারা ভালোবাসে নি ওকে। বাবার কর্মচারী হিসেবেই দেখে এসেছে এতদিন।

'মার্নো।' হাত তুলে ডাকল লারা।

থেমে ঘুরে তকোলো মার্নো। 'আমি চলে যাচ্ছি, লারা। তোমার ওপর কোনো অভিযোগ নেই আমার। হয়তো ভেবে একটু কষ্ট পাবো, তুমিও অবিশ্বাস করলে আমাকে। অনেক দেশ আছে পশ্চিমে। দেখার সুযোগ হয় নি। ভাবছি সেদিকেই যাবো।'

শেরিফের অফিস থেকে ফেরার পথে একটা ব্যাংকের সামনে দেখা হলো বোম্যানের সঙ্গে। খালি বাড়ির আস্তাবলে রাখা ঘোড়াগুলোর কথা বললো মার্নো। 'ওগুলোও তোমার, বোম্যান।'

'শিওর, মার্নো।' নীল একটা খাম মার্নোর হাতে দিয়ে বললো বোম্যান। 'যে ফ্ল্যাট রেটে গরুগুলো বিক্রি করলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা অনুরোধ করছি। আশা করি রাখবে। আমার আস্তাবলে একটা স্ট্যালিয়্যান ঘোড়া আছে তুমি জানো। প্রায়ই ঘোড়াটার কথা বলতে তুমি। এখন থেকে ওটা তোমার।'

রাস্তার ডানদিকের একটা বাড়ির দরজা খুলে গেলো হঠাৎ। দেখলো মার্নো, এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালো বাইরে। লন মেলকর।

'শরীরটা খুব দুর্বল এখনও, বয়। তবে ঠিক হয়ে যাবে শিগগির। অনেক রক্ত ঝরেছে শরীর থেকে। প্রথম ক'দিন খুব কষ্ট হবে চলতে। কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে নাও, ঠিকই যেতে পারবো।' একটা হাত তুলে শহরটা দেখালো বৃদ্ধ—'এখানকার কেউ আমাকে দেখতে পারে না। সবাই ঘৃণা করে। নতুন একটা দেশে যেতে চাই আমি।'

মার্নোর মন ছুঁয়ে গেলো বৃদ্ধের কথাগুলো। 'ঠিক আছে, লন। উঠে পড়ো। পশ্চিমে যাবো আমরা। আরিজোনার বাইরে।'

অনেক কষ্টে ঘোড়ায় উঠে বসলো লন মেলকর। মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো ব্যথায়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে লেগে আছে এক টুকরো হাসি। 'লেটস গো, সন্। দ্য ওয়েস্ট।' ॥ শেষ ॥